# 5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

# HISTORY

**West Bengal Council of Higher Secondary Education**
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

# 5 YEAR QUESTIONS
# WITH
# SAMPLE ANSWERS

# HISTORY

**West Bengal Council of Higher Secondary Education**
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

**Published by :**

West Bengal Council of Higher Secondary Education

**Published on :**

October, 2020

**Printed By :**

Saraswaty Press Limited

(Government of West Bengal Enterprise)

**Price :** Rs. 40.00 only

# পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২ ব্লক ডি.জে. সেক্টর-২ সল্টলেক সিটি

কলকাতা-৭০০০৯১

---

নং ঃ L / PR / 156 / 2020 তারিখ ঃ 10.10.2020

## ভূমিকা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে এবং সংসদের অ্যাকাডেমিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই প্রথম ২০১৫-২০১৯ এই পাঁচ বছরের ইংরেজী, সংস্কৃত, নিউট্রিশন, এডুকেশন, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি এবং সোসিওলজি এই ৯টি বিষয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের বই প্রকাশ করা হলো।

বর্তমান বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পঠন-পাঠনের অসুবিধে এবং ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চাহিদা বিবেচনা করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে সংসদের এই উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে সংসদ বর্তমান সিলেবাসের Sample Question সহ Question Pattern, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'Concepts with Sample Question and Solution' এবং Mock Test Papers প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের আশা এই বইগুলির মাধ্যমে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হবে।

**মহুয়া দাস**
**সভাপতি**
**পঃ বঃ উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদ**

# সূচিপত্র

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

## HISTORY


| Year | Page No. |
|---|---|
| 2015 (Part-A & Part B) | 1-24 |
| 2016 (Part-A & Part B) | 25-51 |
| 2017 (Part-A & Part B) | 52-72 |
| 2018 (Part-A & Part B) | 73-101 |
| 2019 (Part-A & Part B) | 102-119 |

# HISTORY

# 2015

## বিভাগ - ক

**i) মিথ (উপকথা) ও লিজেণ্ড (পুরাকাহিনি) বলতে কী বোঝো? অতীত বিষয়ে মানুষের ধারণাকে এরা কীভাবে রূপদান করে? (৫+৩=৮)**

মানবসমাজের অতীতের বিভিন্ন কাহিনি মধুর স্মৃতির পথ বেয়ে বংশ পরম্পরায় পরবর্তী যুগে পৌঁছায়। তা দিয়েই প্রতিটি মানবসমাজের অতীত ইতিহাস রচিত হয়। মানবসমাজের অতীত ইতিহাসের এসব ঘটনা ও কাহিনির বিবরণ যুগের পর যুগ অতিক্রম করে নানা পদ্ধতিতে বংশ পরম্পরায় পরবর্তী প্রজন্মের সমাজে প্রবাহিত হয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল পৌরাণিক কাহিনি, কিংবদন্তির কাহিনি, লোককথা, স্মৃতিকথা মুখে মুখে প্রচারিত কথা প্রভৃতি জনশ্রুতি।

প্রাচীনকালে যে সময়ে ইতিহাসের কোন লিখিত পাওয়া যায় না। সেই যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয়। এই যুগের বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি বা মিথ (Myth) থেকে সে যুগের কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা জানা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন কাহিনি বা ঘটনার বিবরণ যে ঐতিহাসিক উপাদানগুলিতে তুলে ধরা হয় তাকে পৌরাণিক কাহিনি বলে। এটি সাহিত্যের সর্বপ্রথম রূপ, এককথায় মৌখিক ইতিহাস জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনিগুলির ভিত্তি হল মানবসভ্যতার উদ্ভবের পূর্ব ঐশ্বরিক জগতে সংঘটিত হওয়া নানা কাল্পনিক ঘটনা। হিন্দুপুরাণ অনুসারে ভগবান ব্রহ্মার মানস কন্যা হলে দেবী দূর্গা। একসময় বিশ্বসংসারে অসুরদের রাজত্ব চলছিল, চারিদিকে অসুরদের জয়জয়কার ছড়িয়ে পড়েছিল। অসুরদের দাপটে মানবকুল চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, অসুররা তাদের অপশক্তির দ্বারা সবার স্বাধীনতা কেড়েনিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ভগবান ব্রহ্মা তাঁর মানসকন্যা দেবী দূর্গাকে সৃষ্টি করে তাঁকে সর্বশক্তিতে শক্তিশালী করে অসুরদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মর্ত্যে পাঠান। দেবী দূর্গা মর্ত্যে এসে তাঁর দিব্যশক্তির দ্বারা অসুর শক্তিকে পরাজিত করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন।

পৌরাণিক কাহিনিগুলি অতীতের সময় থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান মানব সমাজে প্রচলিত হয়।

পৌরাণিক কাহিনিগুলি হল প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস। মানব সভ্যতার উন্মেষের আগে মানুষ কেমন ছিল তার বিভিন্ন খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়। এই কাহিনিগুলিতে।

পৌরাণিক বিবরণের ভাষা এমন হয় যা আমাদের উপলব্ধির বাইরের বিষয়গুলির বিবরণও দেয়। অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক জগতের বিষয় আমাদের উপলব্ধির বাইরে। অথচ পৌরাণিক

কাহিনির ভাষার মাধ্যমে আমরা সেই অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক জগত সম্পর্কেও পরিচিত হতে পারি।

পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে অতীত ইতিহাসের বহু সত্য ও যথার্থ উপাদান লুকিয়ে থাকে।

পৌরাণিক কাহিনিগুলির সঙ্গে তুলনামূলক পদ্ধতিতে যাচাই করে ইতিহাসের বহু সাল, তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

ড. রণবীর চক্রবর্ত্তী মনে করেন যে, পুরাণে বর্ণিত রাজবংশগুলির অস্তিত্বের বেশিরভাগই সত্য।

পৌরাণিক কাহিনিগুলি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনিতে প্রাচীন মানব সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গল্প বহুযুগ অতিক্রম করে বর্তমানকালেও প্রচলিত রয়েছে।

মৌখিক ইতিহাসের একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে কিংবদন্তির কাহিনি (Legends)কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত লেজেন্ড আঞ্চলিক ঐতিহ্য। জনপ্রিয় অ্যান্টিকুইটিস নামের আডিগাফকে বাংলায় 'কিংবদন্তি' বলা হয়।

কিংবদন্তি কাহিনিগুলিতে যে সব ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয় বা যেসব চরিত্রের উল্লেখ করা হয় অতীতে একসময় যেসব ঘটনা ঘটেছিল বা যেসব চরিত্র জীবন্ত ছিল বলে লোকসমাজ বিশ্বাস করে থাকে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, অতীতকাল থেকে লোকসমাজে প্রচলিত কিংবদন্তি কাহিনিগুলিতে সামান্য পরিমাণে হলেও অতীতের বহু ঐতিহাসিক তথ্য ও সূত্র থাকে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে, মানুষ সামাজিক বিবর্তনের অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর কিংবদন্তি কাহিনির সৃষ্টি শুরু হয়েছে।

প্রাচীন কিংবদন্তি বা লেজেন্ডের কাহিনিগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি হয়—

কিংবদন্তির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ইতিহাস নির্ভর কাহিনি, প্রেম-বিরহ সম্পর্কিত কাহিনি, আধ্যাত্মিক ঘটনা, পরি বা ভূত-প্রেতের কাহিনি, সন্ন্যাসী ফকির-পীর দরবেশের কাহিনি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনা কিংবদন্তির বিষয়বস্তু হয়ে থাকে।

কিংবদন্তির ঘটনাবলির সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও একথা সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, কিংবদন্তির চরিত্রগুলি অতীতকালে একসময় জীবিত ছিলেন। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, হারকিউলিস, প্রমিথিউস প্রমুখ কিংবদন্তি চরিত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ প্রায় নিশ্চিত।

কিংবদন্তি হল ইতিহাসের অপত্য ফসল। বিস্ময় ও কল্পনা কিংবদন্তির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সক্রিয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য কিংবদন্তি চরিত্র ও ঘটনাবলি ছড়িয়ে রয়েছে। রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, হারকিউলিস, প্রমিথিউস প্রমুখ কিংবদন্তি চরিত্রের সঙ্গে বহু গল্প কাহিনি মিশে থাকলেও বাস্তবে এসব চরিত্র যে জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের জীবনে সংঘটিত কিছু কিছু ঘটনার যে বাস্তব অস্তিত্ব ছিল, তা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন।

প্রাচীন ভারতের মহাকাব্য রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কিংবদন্তি চরিত্র।

মহাকাব্য মহাভারতে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রটিও অন্যতম একটি কিংবদন্তি চরিত্র।

মৌখিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কিংবদন্তিগুলির গুরুত্বগুলি হল—

বিভিন্ন কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সভ্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। উদাহরণ হিসাবে পূর্ববঙ্গের সীতারকোট, বেহুলার বাসরঘর, অরুণধাপ ঢিবি, টুঙ্গির শহর ঢিবি প্রভৃতি স্থান সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে।

কিংবদন্তির ঘটনাগুলি অতীতকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে লোকসমাজকে আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। কিংবদন্তিতে আনন্দদায়ক উপাদান আছে বলেই এগুলি বংশপরম্পরায় বর্তমানকালে এসে পৌঁছেছে।

বর্তমানকালের মানুষকে কিংবদন্তির ঘটনাগুলি অতীতের নৈতিকতা, বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে। এগুলি থেকে বর্তমানকালের মানুষ নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করতে পারে।

**ii) উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে হবসন-লেনিনের তত্ত্ব আলোচনা করো।** ৮

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে উন্নত দেশগুলি যেমন- ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি প্রভৃতি উদ্‌বৃত্ত শিল্পপণ্যকে বাজারজাত করার জন্য অন্যত্র উপনিবেশ বিস্তার ও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে।

শিল্পজাতপণ্যের বাজারে বিপণন ও সস্তাদরে উপনিবেশ থেকে বা দখলিকৃত সাম্রাজ্য থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ধনবৃদ্ধির পথ এই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য।

মূলত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির দ্বারা অনুসৃত এই উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে নয়া উপনিবেশবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলে।

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাদাতাদের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগণ্য হলেন জে. এ. হবসন ও ভি. আই. লেনিন। তাদের ব্যাখ্যা 'হবসন-লেনিন থিসিস' নামে পরিচিত।

হবসনের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় ১৯০২তে, 'Imperialism : A study' গ্রন্থে। সাম্রাজ্যবাদের মূল শিকড় হল উদ্‌বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র অনুসন্ধান। উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ছিল পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশে বিকশিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি। হবসন বলছেন যে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতি মালিকদের হাতে

বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর মূলধন সঞ্চিত হয়। এই মূলধনের পাহাড় সৃষ্টি হলে সমাজে ধনসম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য দেখা যায়। পুঁজিপতিরা এশিয়া ও আফ্রিকাকে কাঁচামাল সংগ্রহ করার অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করে, নিজেদের দেশে শিল্পের প্রসার ঘটাতে শুরু করে। উৎপাদিত দ্রব্য অনুন্নত দেশগুলিতে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। প্রচুর উদ্‌বৃত্ত পুঁজি সৃষ্টি হতে থাকে। তখন এই পুঁজি নতুন করে বিনিয়োগ করে আরও বেশি মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

পুঁজিপতিদের অনুরোধে সমস্ত দেশ তখন যাদের উদ্‌বৃত্ত পুঁজি আছে, উপনিবেশে বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা অর্জন করার পরিকল্পনা করে। তারা নিজের সরকারকে চাপ দিয়ে উপনিবেশ দখল করতে বাধ্য করে।

হবসন মনে করেন যে, উপনিবেশিক রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধিক মুনাফা ও সম্পদবৃদ্ধি। তারা সস্তায় কাঁচামাল কিনে, উচ্চমূল্যে পণ্যবিক্রি ও বাজার দখল করে এশিয়া ও আফ্রিকার মত দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে ধারাবাহিক সময় ধরে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উপনিবেশের বাজারে নিজের শিল্পজাত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে আরও মুনাফা অর্জন যার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

হবসন মনে করেন যে পুঁজিপতিদের শ্রেণির বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং তা বিনিয়োগের জন্য উপনিবেশ প্রতিহত করা সম্ভব। তিনি বলেন যে, সম্পদের সুষমবন্টন ও আভ্যন্তরীণ সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব। পুঁজিপতিদের বাড়তি মূলধন যদি দরিদ্রশ্রেণির মধ্যে বিতরণ করা যায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার হয়। তার মতে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে তারা কলকারখানায় উৎপাদিত উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী কিনে ব্যবহার করলে, তখন উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী বিক্রির জন্য আর উপনিবেশ দখলের প্রয়োজন হবে না।

কমিউনিস্ট নেতা ভি. আই. লেনিন, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক প্রসারের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার লেখা গ্রন্থে— Imperialism– the Highest stage of capitalism.

তিনি বলছেন পুঁজির উদ্ভব ঘটেছে শিল্পের অগ্রগতির জন্য ইউরোপের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে। এই সঞ্চিত পুঁজি লাভজনকভাবে বিনিয়োগ। এই পুঁজি ইউরোপের গন্ডির মধ্যে বিনিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভাবনা কম ছিল। এই জন্য তারা ইউরোপের বাইরে নতুন উপনিবেশের প্রসার ঘটিয়ে যেখানে উদ্‌বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই বাস্তব প্রয়োজন থেকেই ইউরোপের পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলির এশিয়া ও আফ্রিকায় বিভিন্ন দেশে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে সেখানে পুঁজি লগ্নির উদ্যোগ নেয়।

বাজার দখল ও কাঁচামাল সংগ্রহ লেনিনের মতে পুঁজিবাদের জঠরে সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শিল্পমালিকেরা বেশি মুনাফা লাভের আশায় দেশের প্রয়োজনের থেকে

বেশি পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এইসব পণ্য বিক্রি এবং শিল্প উৎপাদনের জন্য সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশ দখলের চেষ্টা চালায়।

বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উপনিবেশ দখলের উদ্যোগ নিলেও উপনিবেশের সংখ্যা ছিল সীমিত। ফলে উপনিবেশ দখলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা বা শত্রুতার সূচনা হয়, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল যুদ্ধ। পুঁজিবাদী অর্থনীতি হল যুদ্ধের জন্মদাতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ পুঁজিবাদী শক্তিগুলির কর্তৃক উপনিবেশ দখলের লড়াই।

শ্রমিক শ্রেণির উন্নত জীবনের দিকে ও উন্নত দেশগুলির নজর ছিল। তারা এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশ বেছে নিয়েছে, সেখানকার শ্রমিকদের সীমাহীন শোষণ করে শিল্পস্থাপন করার জন্য পুঁজি বিনিয়োগে শিল্পস্থাপন আরও ফলপ্রসূ হবার জন্য নিজেদের দেশে ইউরোপে তাদের উন্নত শ্রমিক শ্রেণি একধরনের অনুগত হয়ে শ্রমিক বিপ্লবকে উপেক্ষা করে বুর্জোয়াদের সমর্থন করে।

এই হবসন ও লেনিনের ব্যাখ্যার ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও, এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ডেভিড টমসন বলেন, উনিশ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক সাগরপাড়ে নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র সন্ধানের আগ্রহ তাদের উপনিবেশ দখলে বিশেষ উদ্যোগী করে তুলেছিল।

**iii) ক্যান্টন বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? এই বাণিজ্যের অবসান কেন হয়?** 4+4

ক্যান্টন বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধ বন্দর হিসাবে এবং চীনের ক্যান্টন বন্দরে ১৭৫৯সালে বিদেশি বণিকেরা চীনে যে সাদা রেশম, সবুজ চা, খনিজ দ্রব্য রপ্তানির লোভে দেশের ভিতর প্রবেশ করবার চেষ্টা করে তখন একমাত্র ক্যান্টনকে বিদেশি বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করে।

বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্য ক্যান্টন বাণিজ্য কেবলমাত্র ক্যান্টন বন্দরকেন্দ্রিক ছিল। চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইচ্ছুক বিদেশিরা কেবল ক্যান্টন বন্দরের মাধ্যমেই আমদানি রপ্তানি করত।

**বিদেশি বণিকদের অসুবিধা—**

ক্যান্টন বাণিজ্যে বিদেশি বণিকদের নানান প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হত। বণিকরা সুযোগসুবিধা পেত না এবং ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক, রাজাদের সাথে তেমন যোগাযোগ বা চুক্তি সম্ভব ছিল না।

সমমর্যাদাহীন বাণিজ্য করতে হত। বিধিনিষেধ মেনে এবং উপঢৌকন দিয়ে সমস্ত জায়গায় বাণিজ্যের অধিকার পেত না বিদেশিরা। নজরানা বহির্ভূত ছিল এই বাণিজ্য।

কো-হং বণিকরা এখানে চীন সরকার অনুমোদিত। ১৩টি বণিক সংস্থা নিয়ে গড়ে ওঠে। বিদেশিরা এই সংস্থার (১৩টি বাণিজ্য সংস্থান নিয়ে গড়ে ওঠে) মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় ও বিক্রি করত। তারাই বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করত। ওরা বাণিজ্য শুল্ক আদায় করে সরকারকে তা প্রদান করত। তারা বিদেশিদের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ দালালি হিসাবে নিত।

মূল শহরে প্রবেশের বাধা ছিল মূল ফটকের বাইরে একটি নির্দিষ্টস্থানে বসবাস ও বাণিজ্য চালাতে হত। কখনোই তারা মূল শহরে প্রবেশ করতে পারত না। তাদের কো-হং সংস্থাকে ৬০০টেল ভাড়া দিতে হত বসবাস করবার জন্য। এই এলাকায় আই-কোয়ান বা বর্বরদের ঘর বলে পরিচিত।

ক্যান্টন এলাকা চীনা ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক আইন মেনে চলত। বিদেশি বণিকরা চীনা ভাষা ও আদবকায়দা শিখতে পারত না। মহিলা বা আগ্নেয়াস্ত্র প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। চীনে বিদেশি বণিকদের জন্য এই কঠোর নীতিকে রুদ্ধদ্বার নীতি বলা হত।

এই ক্যান্টন বাণিজ্যর বিধিনিষেধ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকার পাশাপাশি বণিকদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর নিষেধাজ্ঞা চালানোকে বিদেশিরা মেনে নিতে পারেনি।

চীনের অভ্যন্তরে বিদেশি বণিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় সম্পূণ বিদেশি বাণিজ্য কো-হং নিয়ন্ত্রণ করত। তারা পরে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে বিদেশি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিদেশি বণিকদের মিলতে না দেওয়াতে চীনাদের সাথে সামাজিক আদানপ্রদান ঘটেনি।

চীন ও বিদেশিদের বিরুদ্ধ মনোভাব বিদেশি তথা ব্রিটিশ বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে ব্রিটিশ বণিকরা চোরাপথে ভারত থেকে চীনে অফিস রপ্তানি করতে শুরু করলে ক্যান্টন বাণিজ্যের চরিত্র বদলাতে শুরু করে। অফিসের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে চীনের সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ বাধে এবং প্রথম আফিম এর যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২) সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের ফলে ক্যান্টন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এইভাবে ক্যান্টন বাণিজ্য প্রথার অবসান ঘটে।

**অথবা— পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা করো।** ৮

পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল তুলনামূলক আলোচনা কর।

পলাশির যুদ্ধে ১৭৫৭, ২৩ জুন ভাগীরথীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সাথে ক্লাইভের নেতৃত্ব ইংরেজদের যে লড়াই হয়েছিল তা ভারত ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এই যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের ফলে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য প্রায় ২০০ বছরের জন্য অস্তমিত হয়। তাই এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই পলাশির যুদ্ধের ফলাফল বা গুরত্বগুলি হল—

পলাশির যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিক থেকে এটি ছিল একটি খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। এই যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ৫০০ জন এবং ইংরেজদের পক্ষে মাত্র ২২জন সেনার মৃত্যু হয়। পলাশির যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা ও ব্যাগপকতার দিক থেকে এটি ছিল একটি খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। মীরজাফর ব্রিটিশ সাথে মিলে নবাবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এই যুদ্ধে হেরে ভারতের পূর্বদিকে সমৃদ্ধ অঞ্চল বিদেশিদের অধীনে গেল। ইংরেজরা ভারতে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। তারা নৃপতি বানানোর চেষ্টায় উদ্যত হয়। নিজেদের অনুগত মানুষকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে বাংলা থেকে বিপুল অর্থ ইউরোপে পাঠাতে শুরু করে। According to Tarachand, "The defeat of plassey exposed all the Indian weaknesses."

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারপর ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ঘটায়।

বাংলা থেকে যে কোনভাবে টাকা লুঠ করে তা ইউরোপে পাঠাত। যুদ্ধ পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানি ও কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়। বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো বিধস্ত হয়ে পড়ে। এই লুন্ঠনকে পলাশির লুন্ঠন বলে।

ফরাসিরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হয় ব্রিটিশদের দ্বারা পলাশীর যুদ্ধের পর। বাংলার অর্থে ইংরেজরা দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে।

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা এদেশের সমাজ ও সভ্যতায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টা করায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবেশ ও প্রসার ঘটে। যদুনাথ সরকার বলেছেন—"on 23rd june, 1757, the middle ages of India ended and her modern age began."

বক্সারের যুদ্ধ ১৭৬৪ ২২অক্টোবর মোগলসম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্‌দৌলা এবং বাংলার নবাব মীরকাশিমের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বক্সার প্রান্তরে যে যুদ্ধ হয়, তাকে বক্সার যুদ্ধ বলে বর্ণিত। (Plassey was cannonade but Buxar was a decisive battle)

ব্রিটিশ প্রভুত্ব বাংলা তথা ভারতে বিস্তার করলে বক্সারের যুদ্ধ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। Ramsay Moore বলেছেন—বক্সার বাংলার উপর কোম্পানির শাসন-শৃঙ্খলাকে দূর্দান্তভাবে স্থাপন করেছিল।

ভারতীয় শাসকদের অযোগ্যতা প্রমাণ করে বক্সারের যুদ্ধ। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব ও মোঘল সম্রাট একসাথে পরাজিত হয়।

নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করে প্রবলভাবে বাংলার নবাবের পক্ষে ইংরেজ বিরোধিতার আর কোন সুযোগ রইল না। সেইসময় থেকে বাংলার নবাব কোম্পানির বৃত্তিভোগী নবাবে পরিণত হয়।

কোম্পানির লর্ড ক্লাইভ বার্ষিক ২৬লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে ১৭৬৫ সালে। এই চুক্তি অনুসারে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার পান।

বাংলার কুটীর শিল্প ও বাঙালির ব্যবসা বাণিজ্যর ধ্বংস সাধন করে ব্রিটিশরা একচেটিয়াভাবে শিল্প বাণিজ্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে।

এইভাবে বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে। বক্সারের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ও তাৎপর্যপূণ ঘটনা।

**iv) ভারতের সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহনের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করো। ৮**

ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় যে সমস্ত মানুষ প্রচলিত ধ্যান ধারণার সংস্কারের কথা ভেবেছেন ও সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম। আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসাবে তার অবদান অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে 'ভারতপথিক' বলে সম্মান জানান। Maxmuller বলেন—''রামমোহনই প্রথম পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে জীবনতরঙ্গ সংযোগ করেন।

রামমোহন ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত। তিনি হিন্দুসমাজের কুপ্রথাগুলি দূর করে সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হিন্দুসমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কন্যাপণ, জাতিভেদ, কৌলিন্য প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তৎকালীন হিন্দু সমাজে উচ্চবর্ণের মধ্যে মৃত স্বামীর চিতায় তার জীবিত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত বলা হত সতীদাহ প্রথা।

রামমোহন রায় ১৮১৮ সাল থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বিভিন্ন বই ও সংবাদ কৌমুদীতে লেখা প্রকাশ করেন। অবশেষে তার অনুপ্রেরণায় লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে ১৭নং রেগুলেশন জারি করে সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন।

নারীকে মর্যাদা সহকারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হন। সম্পত্তির অংশীদারিত্বেও নারীর অধিকারের কথা বলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলন ও নারীশিক্ষার প্রসারে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

Percival Spear তাঁকে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ধর্মসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও সামাজিক সংস্কার ভারতবর্ষকে এক নতুনপথের দিশা দেখায়।

## বিভাগ- খ

**v) মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের (1919) সমালোচনামূলক আলোচনা করো। ৮**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের মানুষদের অসন্তোষ দূর করতে ভারত সচিব মন্টেগু ও বড়োলাট ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড যৌথ রিপোর্ট তৈরি করেন। তার ভিত্তিতে নতুন ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করে। যাকে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার বা মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার বলে।

এই আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ বা বড়োলাটের শাসন পরিষদ (Executive Council) গঠন করা হয়। এই পরিষদ ৯জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে অন্তত ৩জন সদস্য ছিলেন ভারতীয়। শাসন পরিচালনা বড়োলাট পরিষদের সহায়তায় নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। তিনি তার কার্যাবলির জন্য সরাসরি ভারত সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকবেন। ভারতীয় আইন সভার কাছে নয়। কেন্দ্রীয় আইনসভার সারা ভারতের জন্য আইনপ্রণয়ন করার অধিকারী ছিল। আইনসভার সদস্যরা সভায় কোনো বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন, বিতর্কে যোগদান, ছাঁটাই বা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ প্রভৃতির অধিকার পেলেও বৈদেশিক নীতি, সামরিক বিভাগ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বড়োলাটের আগাম অনুমতি ছাড়া তারা এসব বিষয়ে আলোচনার অনুমতি পেত না। বড়োলাট নিজেও Ordinance জারি করে আইন প্রণয়ন করতে পারতেন।

কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়। এর নিম্নকক্ষের নাম Legislative Assembly (কেন্দ্রীয় আইনসভা) আর উচ্চকক্ষের নাম council of states (রাষ্ট্রীয় পরিষদ)। উচ্চকক্ষে ৬০জন সদস্য যার মধ্যে ২৬জন বড়লাট দ্বারা মনোনীত বাকি নির্বাচিত। নিম্নকক্ষে ১৪৫জনের মধ্যে ৪০জন মনোনীত বাকি নির্বাচিত হয়। দুইকক্ষের সদস্যদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা হয়। ভারতীয়দের মধ্যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিভিন্ন প্রদেশে গঠন, তার ৭০% নির্বাচিত ও বাকি ৩০% গভর্নর দ্বারা মনোনীত, দুরকম বিষয় সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই সংস্কারের ফলাফল। ভারতে Dyarchy বা দ্বৈতশাসনব্যবস্থা চালু হয় Montague– Chelmsford Reform Act 1919 এর দ্বারা।

এই সংস্কার পরে সমালোচিত হয় নানা কারণে—

প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার অভাব বা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ নেই।

ভাইসরয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রে ও প্রদেশে গভর্নর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। তারা ইচ্ছে করলেই মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারেন।

স্বায়ত্ত শাসনের অভাব প্রদেশে এবং গভর্নর সর্বেসর্বা।

নির্বাচিত আইনসভা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে গভর্নর জেনারেল ও গভর্নর সকল ক্ষমতার অধিকারী।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোতে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

স্বল্প সংখ্যক ধনী ব্যক্তি ভোটাধিকার পেলে সর্বসাধারণ বঞ্চিত হন (প্রায় ৯০%)।

মুসলিমদের পৃথক ভোটাধিকার দান করা হলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি পায়। Annie Besant এটিকে দাসত্বের পরিকল্পনা বলে সমালোচনা করেন। জাতীয় কংগ্রেস বোম্বাই অধিবেশনে ও এটি একইভাবে সমালোচিত হয়।

**vi) হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৮**

ভিয়েতনামে বিদেশি অধিপত্যর বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের নেতা ছিলেন সাম্যবাদী আদর্শে দীক্ষিত নগুয়েন আই কুয়োকমিনি হো চি-মিন নামে পরিচিত। তিনি ১৯৩০শে 'Vietnam workers party' গঠন করেন এবং পরবর্তীকালে ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে নতুন মতার্দশে মানুষকে উজ্জীবিত করে। জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য ছিল সর্বপ্রথম স্বীকার্য। নগুয়েন গিয়াপকে নিয়ে একটি গুপ্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। গেরিলা যুদ্ধে এই দল হয়ে ওঠে পারদর্শী। ইন্দোচীনে ফরাসি সাম্রাজবাদের অবসান ও জাপানের আবির্ভাবের সুযোে গ আন্নাম এর সম্রাট বাও দাই এবং কম্বোজ ও লাওসের রাজারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এই সময় হো চি-মিন সাতটি প্রদেশে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

পটসডাম কনফারেন্সে ১৯৪৫ সালে ইন্দোচীন দ্বিখণ্ডিত হয়- উত্তরপ্রান্ত কুয়োমিনতাং এর দখলে ও দাক্ষিণাংশে ব্রিটিশ দায়িত্ব গ্রহণ করবে সিদ্ধান্ত হয়। কুয়োমিনতাং উত্তরাংশ হো চি মিনের হাতে তুলে দেয়। তার লক্ষ্য ভিয়েতনামের স্বাধীনতা লাভ। ফ্রান্স এদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল ব্রিটেনের হাত থেকে ক্ষমতাভার গ্রহণ করে এবং আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সমগ্র ইন্দোচীন হয়ে উঠে ফ্রান্সের পরবর্তী লক্ষ্য। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয় ফরাসিদের সঙ্গে ভিয়েতনামের যুদ্ধ। বাধ্য হয়ে ফরাসিরা ১৯৪৬, ১মার্চ ভিয়েতনামের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফ্রান্স হো চি মিনের সরকারকে স্বীকৃতি দেবে বললেও কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্স ওই চুক্তি ভঙ্গ করে বাও দাইকে ভিয়েতনামের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করে। হাইফং বন্দর ও সংলগ্ন অঞ্চল'এ বোমা বর্ষণ করে ৬০০০ অসামরিক ভিয়েতনামবাসীকে হত্যা করে। এই ঘটনার পর সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ফ্রান্সের বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে ভিয়েতমিনরা ফরাসি অধিকৃত টংকিং-এ আক্রমণ চালায়। এইভাবে ইন্দোচীনে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যা দীর্ঘ আট বছর ধরে চলে। ১৯৫৩ সালে

শেষের দিকে ফরাসি বাহিনী ক্রমাগত পরাজয় বরণ করতে থাকে। হ্যানয় ও হাইফংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলও তাদের হাতছাড়া হয়। এই অবস্থায় ফরাসি সেনাপতি নেভারে ভিয়েতমিনদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করার লক্ষ্যে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা 'নেভারের প্ল্যান' নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুসারে ফ্রান্স উত্তর ভিয়েতনামের টংকিংয়ের দিয়েন-বিয়েনফু নামক স্থানে একটি সশস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণ করে। এই খবর পেয়ে ভিয়েতমিন সেনাপতি জেনারেল নগুয়েন গিয়াপ সেই ঘাঁটি ধ্বংস করেন ও ১৫০০ ফরাসি সেনাকে বন্দি করেন। ৫৭দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ফরাসি বাহিনী আত্মসমপর্ণে বাধ্য হয় (৭মে ১৯৫৪)।

জেনেভা সম্মেলন ১৯৫৪, ৮মে বসে। এই সম্মেলনে হোচিমিন সরকারের সঙ্গে ফ্রান্স এক চুক্তি স্বাক্ষর করে যা জেনেভা চুক্তি নামে পরিচিত। সমগ্র ভিয়েতনামে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হবে। ১৭° অক্ষরেখা বরাবর দুইভাগে বিভক্ত করা হবে। উত্তরদিকে হোচিমিনের নেতৃত্বধীন ও দক্ষিণদিক অক্ষরেখার ন-দিন-দিয়েম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

শান্তিপূর্ণ আলোচনার জন্য ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাই ঠিক হয়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভিয়েতনামের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জের দ্বারা গঠিত একটি তদারকি কমিশনের নেতৃত্বে দুবছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভিয়েতনামের নির্বাচন তদারকির উদ্দেশে ভারতের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়। উত্তর বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোথাও কোনো বিদেশি সৈন্য থাকবে না। লাওস ও কম্বোডিয়া থেকে ফরাসি ও ভিয়েতমিন বাহিনী অপসারিত করা হবে।

জেনেভা চুক্তির দ্বারা ভিয়েতনামে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটে, লাওস ও কম্বোডিয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভিয়েতনামে যুদ্ধ বিরতি হলেও সমস্যা প্রশমন হয় না। কারণ আমেরিকা বুঝেছিল যে ভিয়েতনামে নির্বাচন হলে হো-চি-মিন নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করবে ও ওই অঞ্চলে সাম্যবাদের প্রসার ঘটবে। তাই ভিয়েতনামে নির্বাচন বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এইজন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মার্কিন মদত পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্টপতি ন-দিন-দিয়েম ঘোষণা করেন যে, দক্ষিণ ভিয়েতনাম স্বাক্ষরকারী না হওয়ায় সেই চুক্তি পালনের বিষয়ে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এরফলে ভিয়েতনামে নির্বাচনের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আমেরিকা প্রচুর অর্থ সাহায্য করে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে। জেনেভা চুক্তির দেড়মাসের মধ্যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স ও পাকিস্তানকে নিয়ে ম্যানিলায়— SEATO বলে দল গড়ে তোলে। (South-East Asian Treaty Organisation)

উত্তর-ভিয়েতনামে মার্কিন অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে হো চি মিন বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে নিজের সরকারে জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখে। আমেরিকার অনুগত দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার ছিল অপদার্থ। সমগ্র ইন্দোচীনে এর বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ছড়িয়ে

পড়ে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষেরা ১৯৬০ খিস্টাব্দে সেখানকার মানুষেরা গঠন করেন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। উত্তর ভিয়েতনাম এদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করে। শুরু হয় দিয়েম সরকারের সঙ্গে ফ্রন্টের সংঘর্ষ।

১৯৬২সালে ভিয়েতকিংদের বিরুদ্ধে মার্কিন ও দক্ষিণভিয়েতনাম বাহিনী একজোট হয়ে আক্রমণ করে। ফলে ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গণআন্দোলনের ফলে ১৯৬৩ সালে দিয়েম সরকারের পতন ঘটে কিন্তু জেনারেল নগুয়েন ভ্যন থিউ সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ১৯৬৫-র পর ভিয়েতনামে মার্কিন হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। বিষাক্ত গ্যাস ও বিস্ফোরক দিয়ে গাছপালা ধ্বংস ও নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে থাকে। ১৯৬৮ সালে মাইলাই গ্রামে সেনারা সেখানে শিশু ও বৃদ্ধ সহ ৪০০-৪৫০জনকে হত্যা করে—এই ঘটনা মাইলাই ঘটনা নামে পরিচিত। একযোগে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ৪৪টি প্রাদেশিক রাজধানী শহরে আক্রমণ চালানো হয়।

মার্কিন হস্তক্ষেপ ও অত্যাচার চরমে পৌঁছালে আমেরিকার বিরুদ্ধে সারা বিশ্ব প্রতিবাদ জানায়। আমেরিকার অভ্যন্তরে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। এরপর রিচার্ড নিক্সন অবস্থা উপলব্ধি করেন যে, ভিয়েতনামে তার মার্কিন জঙ্গি নীতি চলবে না। আগ্রাসন কমানো আবশ্যক। ২৩জানুয়ারি ১৯৭৩ যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হয় ভিয়েতনাম থেকে। ভিয়েতকংয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করে মার্কিন সৈন্য। হো চি মিনের নেতৃত্বে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ঐক্যবদ্ধ হয়। ভিয়েতনাম স্বাধীন ও সংযুক্ত হয়। প্রথম রাষ্ট্রপতি হন ফাম ভান দং ও রাজধানী হয় হ্যানয়। সংযুক্ত সার্বভৌম ও সমাজবাদী ভিয়েতনাম জন্ম নেয়।

**vii) সুয়েজ সংকট কেন দেখা দিয়েছিল?** ৮

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার মিশরে নিজেদের তাবেদার শাসক প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করলে, মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ও ব্রিটিশ আধিপত্য বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে যখন জেনারেল নেগুইব মিশরের শাসনক্ষমতা দখল করেন। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে গামাল আবদুল নাসের মিশরের ক্ষমতা দখল করেন ১৯৫৪ সালে। দুবছর পর তিনি মিশরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

নাসের ক্ষমতা দখল করলে পশ্চিম শক্তিবর্গ সেটা ভালোভাবে মেনে নিতে পারে না। কারণ ব্রিটেন যখন ব্রিটেন সুয়েজ খালের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ওই অঞ্চলে সেনা মোতায়েনের সময় বৃদ্ধি করতে চায়, নাসির তার প্রতিবাদ জানায়। আফ্রিকায় অবস্থিত ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়ায় ১৯৫৪তে বিদ্রোহ শুরু হলে নাসের বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। মধ্যপ্রাচ্যে রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মিশর এই চুক্তি থেকে দূরে থাকে। পশ্চিমি জোট এতে অসন্তুষ্ট হয়। মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদের বিরোধী ইজরায়েল উত্থান মেনে নিতে পারেননি।

পশ্চিম দেশের থেকে আর্থিক সহায়তা চেয়ে নাসের ব্যর্থ হয় এবং রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৯৬৯সালে সুয়েজখাল দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হয় ও 'Universal Suez Canal Company' এক চুক্তির ভিত্তিতে ১৯ বছরের মেয়াদে এই খাল পরিচালনার দায়িত্ব পায়। এর থেকে মিশর খুব সামান্য অংশ ভাগ পায়। খালের নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশ সেনা মেতায়েন থাকায় সুয়েজখাল ও নিকটবর্তী অঞ্চলে মিশরের কর্তৃত্ব ছিল না। নাসের নীলনদের ওপর Aswan Dam Project গ্রহণ করেন, কারণ ওই বাঁধ নির্মিত হলে মিশরের ৮,৬০,০০০ হেক্টর জমি আবাদযোগ্য হত এবং বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভবপর হত। ব্যয় আনুমানিক ১৪০০ মিলিয়ন ডলার ধার্য হয় এবং ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও বিশ্বব্যাংক প্রাথমিকভাবে ৭০মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে রাজি হয়। ১৯৫৬সালে জুলাই মাসে বিশ্বব্যাংক এই ঋণ প্রস্তাব বাতিল করে দেয় । বাঁধ নির্মাণের জন্য জনরোষ দেখা দেয়। তখন নাসের সুয়েজখাল ও সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি জাতীয়করণ করার কথা ঘোষণা করেন। মনে করা হয়, খাল থেকে সংগৃহীত অর্থ বাঁধ প্রকল্পে ব্যয় হবে। কোম্পানির বিদেশি অংশীদারদের প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্র সব দেশের জাহাজ এই জলপথ ব্যবহার করতে পারবে। জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করলে, অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। পশ্চিমি জোটের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। যে সুয়েজখাল সংকট ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার কারণে নাসেরকে অপসারণের জন্য মিশর আক্রমণ পশ্চিমদেশের লক্ষ্য হয়ে যায়। আমেরিকা চেয়েছিল সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনতে। বলপ্রয়োগ করে মধ্যপ্রাচ্য ও তৃতীয়বিশ্বে আমেরিকা অসন্তোষ দেখা দিক সেটা চায়নি।

সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী ২২টি দেশ নিয়ে লণ্ডনে সম্মেলন ডাকা হলে, মিশর যোগ দিতে অসম্মতি জানায়। ১৮টি দেশ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দিলে, ভারতসহ বাকি দেশ জাতীয়করণের পক্ষে মত দেয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস সুয়েজখাল ব্যবহারকারী সংস্থা গঠন করে, এই সংস্থার মাধ্যমে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেন। নাসের তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাছে এই সুয়েজ সমস্যার কথা পেশ করেন। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুয়েজখালের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। নাসেরের আপত্তি ও সোভিয়েত রাশিয়ার 'ভেটো' প্রয়োগের ফলে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইজরায়েল ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৬ মিশর আক্রমণ করে।

**অথবা— সুয়েজ সংকটের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। এই সংকটে ভারতের ভূমিকা কী ছিল? ৪+৪=৮**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ মিশরে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাবেদার শাসক বসিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও মিশরে ব্রিটিশ অধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫৬সালে মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের নির্বাচিত হন।

পরবর্তী সময় নাসেরের সাথে পশ্চিমি শক্তিবর্গের বিরোধ শুরু হয়। ১৯৫৬সালে ব্রিটেন মিশরের সুয়েজখালের রক্ষণাবেক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে চাইলে নাসের তাতে রাজি হয় না। রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আমেরিকার নেতৃত্বে বাগদাদ চুক্তি থেকে মিশর দূরে থাকার জন্য, পশ্চিমজোট অসন্তুষ্ট হয়। মধ্যপ্রাচ্যে আবার জাতীয়বাদের বিরোধী ইজরায়েলের উত্থান নাসের মেনে নিতে পারেনি।

'ইউনিভার্সাল সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি' ৯৫বছরের মেয়াদে সুয়েজখাল পরিচালনার দায়িত্ব পায়। মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও সুয়েজখাল থেকে আদায় হওয়া অর্থের খুব সামান্য অংশ মিশর পেত। সুয়েজখালও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে মিশরের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তখন নাসের মিশরের নীলনদের ওপর আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই বাঁধ নির্মিত হলে মিশরের ৮,৬০,০০০ হেক্টর জমি আবাদযোগ্য হত এবং বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হত। তাসওয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ১৪০০ মিলিয়ন ডলার। ইংল্যান্ড আমেরিকা ও বিশ্বব্যাংক প্রাথমিকভাবে ৭০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে রাজি হয়। কিন্তু একবছর পর সেই ঋণ প্রস্তাব বাতিল করে। নাসের ১৯৫৬সালে সুয়েজখাল ও সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি জাতীয়করণ করার সে কথা ঘোষণা করেন তাতে জানান যে, সুয়েজখাল থেকে সংগৃহীত অর্থ আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে ব্যয় করা হবে। কোম্পানির বিদেশি অংশীদারদের প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্র হিসাবে সব দেশের জাহাজ এই জলপথ ব্যবহার করতে পারবে।

ব্রিটেন সুয়েজ খালের পথে মধ্যপ্রাচ্য থেকে কাচা তেল আমদানি করত এবং তাই ব্রিটেন জাতীয়করণের ফলে ব্রিটেন ক্ষুব্ধ হয়। ফ্রান্স আগেই মিশরকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। যখন মিশর ফ্রান্সের উপনিবেশ আলজেরিয়াকে সহায়তা করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স বা ইজরায়েল একজোট হয়ে মিশর আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। লন্ডন সম্মেলন ডাকা হয় ১৯৫৬তে এবং ২২টি দেশ যোগদান করে। ১৮টি দেশ জাতীয়করণ সমর্থন করে না এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। ভারতসহ বাকি দেশ এই জাতীয়করণের পক্ষে মত দেয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস 'সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের সংস্থান' গঠন করে এই সংস্থার মাধ্যমে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেন। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ খালের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। তারপর নাসেরের আপত্তি ও সোভিয়েত রাশিয়ার 'ভোটো' প্রয়োগের ফলে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

পশ্চিমি শক্তি মিলে ইজরায়েলের সাথে মিলে মিশর আক্রমণ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা ২নভেম্বর যুদ্ধ বিরতির আবেদন জানায়। জাতিপুঞ্জের নির্দেশে মিশর থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েল তাদের সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি Eisenhower তাঁর নীতি ঘোষণা করেন। এতে বলা হয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনো দেশ অর্থাৎ রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত দেশকে আমেরিকা সহায়তা করবে। এই নীতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা দুবছরের জন্য

৪০০থেকে ৫০০মিলিয়ান ডলার অর্থ বরাদ্দ করে। মধ্যপ্রাচ্য ক্রমশ ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভা ২নভেম্বর যুদ্ধবিরতির আবেদন জানায়। কিছুদিনের মধ্যে জাতিপুঞ্জের নির্দেশে মিশর থেকে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইজরায়েল তাদের সৈন্য অবসারণে বাধ্য হয়।

এই ঘটনায় মিশরের নাসেরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মিশর ও সিরিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন করেন এবং নাসের হন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। ইংল্যান্ডে আর্থিক ক্ষতির ফলে অর্থনীতিতে ধসনামে রাশিয়ার ভাবমূর্তি মধ্যপ্রাচ্যে উজ্জ্বল হয়। Eisenhower Doctrine ঘোষণা করে আমেরিকা।

সুয়েজ সংকটের সমাধানে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাল উন্মুক্ত রাখার প্রয়াস নেয় ভারত। ভারত মনে করত যে, ১৮৮৮ সালে 'Constantinople Convention' অনুসারে সুয়েজ খাল মিশরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। খালের ওপর মিশরের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে খাল সংক্রান্ত সব সমস্যার সমাধান করা হয়।

ভারতের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী কৃষ্ণমেনন ১৯৫৬ সালে লন্ডন সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সম্মেলনে মিশরের কোনো প্রতিনিধি যোগদান না করায় ভারত দুপক্ষের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করে। মিশরে বিদেশি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ভারত। জওহরলাল নেহরু একে 'নগ্ন আক্রমণ' বলে অভিহিত করেন। মিশরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা এবং বিদেশি সৈন্য অপসারণের বিষয়ে আলোচনায় ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভারত জাতিপুঞ্জের শান্তিরক্ষাকারী বাহিনী হিসাবে মিশরে সেনা পাঠান।

**viii) স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান ও শেখ মুজিবর রহমানের ভূমিকা আলোচনা করো। ৮**

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ভারতবিভাগের সূত্র ধরে বঙ্গদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়ে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ শুরু করে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণ শুরু হয়। পূর্ববঙ্গের কৃষিসম্পদ নিয়ে পাকিস্তান শিল্পের প্রসার ঘটায়। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা শাসনক্ষমতা কোনোভাবে অর্জন করলে তাঁদের পদচ্যুত করা হয়—যেমন খাজা নজিমুদ্দিন মহম্মদ আলি বগুড়া, হোসেন সুরাবার্দি প্রমুখ। একসময় প্রধানমন্ত্রী খাজা নজিমুদ্দিনও মনে করতেন যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে সৃষ্ট বাংলা হল হিন্দুদের ভাষা। তাই বাংলা মুসলিমদের ভাষা হওয়া উচিত নয়। বাঙলা ভাষাভাষি মানুষ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা চাপিয়ে দেওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঙলা ভাষাকে মাতৃভাষা করবার

জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়। সরকারি তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলকভাবে ২১টি কেন্দ্রে আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষা শিক্ষাদান করা শুরু করার প্রতিবাদে ১৯৫২সালে ছাত্ররা ১৪৪ধারা ভেঙে ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল দিয়ে এগিয়ে চলে। পুলিশ সেই সংঘর্ষে বেধে গেলে পুলিশ নিরস্ত্র মিছিলে গুলি চালায়। জব্বর, বরকত ও রফিকুদ্দিন আহমেদের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ বাঙালি জাতি যে পাকবিরোধী সংগ্রাম শুরু করে তা ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

১৯৫৪ সালে আওয়ানি লিগ কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। কিন্তু পাক সরকার তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ানি লিগের নেতা শেখ মুজিবর রহমান আন্দোলন শুরু করলে মুজিব-সহ লিগের প্রধান কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ব্যাপক গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার ১৯৬৯ সালে মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানে গণ-অসন্তোষের ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালে ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ানি লিগ ১৬২টি শাসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে পূর্ব পাকিস্তানে জয়লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪০টি আসনে ৮১টি আসন পায় জুলফিকার আলি ভুট্টোর পিপলস পার্টির।

নতুন সংবিধান রচিত হলে পূর্ববাংলার স্বায়ও শাসনের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে পাক রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করলে পূর্ব পাকিস্তান অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন,''এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'' ২৫মার্চ পাক-সেনাবাহিনী শুরু করে গণহত্যা। মুজিবর রহমান আগুন ঝরা বক্তৃতা দেন—'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো' ২৬শে মার্চ মুজিবরের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাক সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আকাশবাণী কলকাতা ধারাবাহিকভাবে প্রচার করলে তা পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতাকামী পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের ও প্রতিটি বাঙালির মনে অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। আওয়ামি লিগের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনী প্রচণ্ড আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বর্বর পাক-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়।

সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় মৌলবাদী মুসলিম নেতারা রাজাকার বাহিনী নামে পরিচিত। মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বিরোধীতা করেন। তারা ২৬৭ দিন ধরে হত্যালীলা চালায়। ১৯৭১সালে গণহত্যার ফলে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ নিহত ও লক্ষ লক্ষ নারী হয় ধর্ষিতা।

পাক-সরকার নেতা মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। ভারতে তখন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করে। শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ান। ভারতীয় সেনাদের সাহয্যে পূর্ববঙ্গের মুক্তিযোদ্ধারা পাক-বাহিনীকে কোণঠাসা করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন করে ভারত ও বাংলাদেশকে। ৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে প্রায় ৯০ হাজার পাকসেনাকে বন্দি করে। শেষ পর্যন্ত পাকসেনা প্রধান জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি ৯৩,০০০ সৈন্য সহ ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

## বিভাগ - খ

**1. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : 1 × 24 = 24**

**(i) ভারতের ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যাকার**

(a) রমেশচন্দ্র মজুমদার (b) জেমস্ মিল

(c) রামশরণ শর্মা (d) রণজিৎ গুহ।

**উঃ** (a) রমেশচন্দ্র মজুমদার

**(ii) Earlu History of India গ্রন্থের রচয়িতা**

(a) জন স্টুয়ার্ট মিল (b) জেমস্ প্রিন্সেপ

(c) কোল্‌ব্রুক (d) ভিনসেন্ট স্মিথ।

**উঃ** (d) ভিনসেন্ট স্মিথ

**(iii) আফ্রিকাতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল**

(a) ইংরেজরা (b) ফরাসিরা

(c) পর্তুগীজরা (d) ওলন্দাজরা।

**উঃ** (b) ফরাসিরা

**(iv) Imperialism : The Highest State of Capitalism গ্রন্থের লেখক**

(a) হবসন (b) হিলফারডিং

(c) লেনিন (d) স্তালিন।

**উঃ** (c) লেনিন

**(v) কে বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটান?**

(a) রবার্ট ক্লাইভ (b) ভেরেলেস্ট

(c) ওয়ারেন হেস্টিংস (d) লর্ড ওয়েলেসলী।

**উঃ** (c) ওয়ারেন হেস্টিংস

**(vi) লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা**

A. দশশালা ব্যবস্থা B. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

C. পাঁচশালা ব্যবস্থা D. রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।

বিকল্পসমূহ :

(a) A ঠিক এবং B, C, D ভুল (b) A, C ঠিক এবং B, D ভুল

(c) A,B ঠিক এবং C,D ভুল (d) A,B,C ঠিক এবং D ভুল।

**উঃ** (c) A,B ঠিক এবং C,D ভুল

**(vii) চীনে ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ..... বন্দরের মধ্য দিয়ে।**

(a) ম্যাকাও (b) সাংহাই

(c) ক্যান্টন (d) নানকিং।

**উঃ** (b) সাংহাই

**(viii)বীরসালিঙ্গম দক্ষিণের ..... নামে পরিচিত।**

(a) গান্ধী (b) রামকৃষ্ণ

(c) বিবেকানন্দ (d) বিদ্যাসাগর।

**উঃ** (d) বিদ্যাসাগর

**(ix) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন**

(a) রামমোহন রায় (b) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(c) কেশবচন্দ্র সেন (d) ডিরোজিও।

**উঃ** (b) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

**(x) সিং-চুং-হুই -এর প্রবর্তক ছিলেন**

(a) সান ইয়াৎসেন (b) চিয়াং-কাই-শেখ

(c) চৌ-এন লাই (d) মাও-সে-তুঙ্

**উঃ** (a) সান ইয়াৎসেন

**(xi) ১৯০৯ খ্রিঃ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন**

(a) মন্টেগু (b) চেমস্‌ফোর্ড

(c) লর্ড কার্জন (d) লর্ড মিন্টো।

**উঃ** (b) চেমসফোর্ড

**(xii) গান্ধী প্রবর্তিত 'হরিজন' এর অর্থ**

(a) অস্পৃশ্য (b) নিপীড়িত

(c) ঈশ্বরের সন্তান (d) তপশিলী জাতি।

**উঃ** (c) ঈশ্বরের সন্তান

**(xiii)ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন**

(a) জহরলাল নেহরু (b) চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী

(c) পট্টভি সীতারামাইয়া (d) মতিলাল নেহরু।

**উঃ** (c) পট্টভি সীতারামাইয়া

**(xiv) নৌবিদ্রোহ প্রথম শুরু হয়**

(a) কাসেল ব্যারাকে (b) কোমাগাটামারু জাহাজে

(c) তলোয়ার জাহাজে (d) একটি আমেরিকান জাহাজে।

**উঃ** (c) তলোয়ার জাহাজে

**(xv) স্তম্ভ-১ এর সাথে স্তম্ভ-২ মেলাও :**

| স্তম্ভ-১ | স্তম্ভ-২ |
|---|---|
| (i) জেনারেল তোজো | (A) ইন্দোনেশিয়া |
| (ii) হো-চি-মিন | (B) চীন |
| (iii) চৌ-এন-লাই | (C) জাপান |
| (iv) সুকর্ণ | (D) ভিয়েতনাম |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-B, (ii)-A, (iii)-D, (iv)-C (b) (i)-C, (ii)-A, (iii)-B, (iv)-D

(c) (i)-A, (ii)-C, (iii)-B, (iv)-D (d) (i)-C, (ii)-D, (iii)-B, (iv)-A.

**উঃ** (d) (i)-C, (ii)-D, (iii)-B, (iv)-A

**(xvi) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন**

(a) উড্রো উইলসন (b) হুভার

(c) রুজভেল্ট (d) ট্রুম্যান।

**উঃ** (c) রুজভেল্ট

**(xvii) ইয়াল্টা সম্মেলন আহুত হয়**

(a) ১৯৪৩ খ্রিঃ (b) ১৯৪৪ খ্রিঃ

(c) ১৯৪৫ খ্রিঃ (d) ১৯৪৬ খ্রিঃ।

**উঃ** (c) ১৯৪৫ খ্রিঃ

**(xviii) সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেন।**

(a) নেহরু (b) নাসের

(c) টিটো (d) চার্চিল।

**উঃ** (b) নাসের

**(xix)আরব লীগে যোগদানকারী দেশ হল**

A. সিরিয়া

B. মিশর

C. লেবানন

D. ট্রান্স-জর্ডন।

*বিকল্পসমূহ :*

(a) A, B ঠিক এবং C, D ভুল (b) B,C,D ঠিক এবং A ভুল

(c) A,B,C,D সবকটি ঠিক (d) A,B,C,D সবকটি ভুল।

**উঃ** (b) B,C,D ঠিক এবং A ভুল

**(xx) উত্তর আটলান্টিক সামরিক জোট (NATO) কবে গঠিত হয়?**

(a) ১৯৪৮ খ্রিঃ (b) ১৯৪৯ খ্রিঃ

(c) ১৯৫০ খ্রিঃ (d) ১৯৫২ খ্রিঃ।

**উঃ** (b) ১৯৪৯ খ্রিঃ

**(xxi)ওলন্দাজদের হাত থেকে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে**

(a) ১৯৭১ খ্রিঃ (b) ১৯৫০ খ্রিঃ

(c) ১৯৫৫ খ্রিঃ (d) ১৯৬০ খ্রিঃ।

**উঃ** (b) ১৯৫০ খ্রিঃ

**(xxii) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন**

(a) মহম্মদ আলি জিন্নাহ (b) জুলফিকর আলি ভুট্টো

(c) ইয়াহিয়া খাঁ (d) আয়ুব খাঁ।

**উঃ** (c) ইয়াহিয়া খা

**(xxiii) ঢাকায় সার্ক (SAARC)-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়**

(a) ১৯৮০ খ্রিঃ (b) ১৯৮৫ খ্রিঃ

(c) ১৯৯০ খ্রিঃ (d) ১৯৮৩ খ্রিঃ।

**উঃ** (b) ১৯৮৫ খ্রিঃ

**(xxiv) ১৯৯০-র দশকের অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি প্রবর্তিত হয় কোন প্রধানমন্ত্রীর সময়**

(a) মনমোহন সিং (b) পি. ভি. নরসিমা রাও

(c) রাজীব গান্ধী (d) অটলবিহারী বাজপেয়ী।

**উঃ** (b) পি. ভি. নরসিমা রাও

**2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও ( বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় ) :** 1×16=16

**(i) আমেরিকা মহাদেশ কে আবিষ্কার করেন?**

**উঃ** ক্রিস্টোফার কলোম্বাস।

অথবা

**ভারতের কোন কোন স্থানে পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি ছিল?**

**উঃ** গোয়া, দমন, বোম্বাই।

**(ii) জে. এ. হবসনের বইটির নাম কি?**

**উঃ** Imperialism : A Study.

অথবা

**হিলফারডিং-এর বইটির নাম লেখো।**

**উঃ** Finance Capital.

**(iii) বাণিজ্যিক মূলধন কাকে বলে?**

**উঃ** বাণিজিক মূলধন-এ পুঁজিকে বারবার ব্যবহার করে সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

**(iv) কোন চার্টার আইনে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বন্ধ হয়ে যায়?**

**উঃ** ১৮১৩ সালের সনদ আইন।

**(v) নানকিং-এর সন্ধির দুটি শর্ত লেখো।**

**উঃ** a) চিনা বানিজ্যে ইংরাজসহ বৈদেশিক জাতি গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ।

b) চিনের ৫টি বন্দর ব্রিটিশদের অবাধ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।

অথবা

**তাইপিং বিদ্রোহ কবে ও কেন হয়?**

**উঃ** ১৮৫০-১৮৬৪ সালে চিনে বিদেশি শাসন মুক্তির জন্য তাইপিং বিদ্রোহ হয়।

**(vi) আলেকজান্ডার ডাফ কে ছিলেন?**

**উঃ** স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

অথবা

**চুঁইয়ে পড়া নীতি কি?**

**উঃ** মেকলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা উচ্চবর্ণের / উচ্চশিক্ষিতদের থেকে সমাজের নিচু তলায় বিস্তার ঘটার বিষয়কে ''চুইয়ে পড়া'' নীতি বলে।

**(vii) দলিত কাদের বলা হয়?**

**উঃ** ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ৩৪১ অনুযায়ী পিছিয়ে পড়া সামাজিক, আর্থিক দিক থেকে তপশিলী জাতি, উপজাতি জনগোষ্ঠীকে 'দলিত' বলে।

**(viii) 'মানুষ গড়ার' আদর্শে কে বিশ্বাসী ছিলেন?**

**উঃ** স্বামী বিবেকানন্দ।

**(ix) রাওলাট আইনের পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল?**

**উঃ** মতামত বা বাক্‌স্বাধীনতা হরন করা, ব্রিটিশ বিরোধী জমায়েত নিষেধাজ্ঞা।

**(x) ভারতীয়রা সাইমন কমিশন বর্জন করেছিল কেন?**

**উঃ** সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায়।

অথবা

**মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দুজন বিদেশী অভিযুক্তের নাম লেখো।**

**উঃ** ফিলিপ স্প্রাট, বেঞ্জামিন ব্রাডলি।

**(xi) ক্যাবিনেট মিশন কেন ভারতে আসে?**

**উঃ** ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পর্যালোচনার জন্য।

**(xii) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**

**উঃ** হিদেকি তোজো।

অথবা

**উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট বাহিনী কি নামে পরিচিত ছিল?**

**উঃ** ভিয়েতমিন।

**(xiii) ট্রুম্যান নীতি কি ছিল?**

**উঃ** রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির যে তত্ত্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন, তাকেই ট্রুম্যান নীতি বলে।

**(xiv)ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?**

**উঃ** কিউবার রাষ্ট্রপতি

অথবা

**কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট বলতে কি বোঝায়?**

**উঃ** কিউবাতে মিসাইল ঘাঁটি তৈরির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ান ও আমেরিকার ১৩ দিন ব্যাপী যুদ্ধ কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সংকট নামে পরিচিত।

**(xv) দিয়েন বিয়েন ফু-তে কি ঘটেছিল?**

**উঃ** ভিয়েতনামের স্বাধীনতালাভ।

অথবা

**বেন বেল্লা কে ছিলেন?**

**উঃ** স্বাধীন আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি।

**(xvi)দঃ আফ্রিকার প্রথম অ-শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রপ্রধানের নাম কি?**

**উঃ** নেলসন ম্যান্ডেলা।

অথবা

**ভারত সরকারের বরাদ্দ অর্থকে যথাযথভাবে ব্যয় করার জন্য কিভাবে ভাগ করা হয়?**

**উঃ** জাতীয় যোজনা কমিশন / পরিকল্পনা কমিশন ব্যয় করে ২ ভাবে।

# HISTORY

## 2016

### বিভাগ -ক

**i) জাদুঘর কাকে বলে? অতীত পুনর্গঠনে যাদুঘরের ভূমিকা আলোচনা কর। (3+5=8)**

উঃ **শব্দের বুৎপত্তি :**—বাংলা জাদুঘর শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Museum মিউজিয়াম শব্দের মূল উৎস হল প্রাচীন গ্রিক শব্দ Mouseion যার অর্থ হল গ্রিক পুরানের শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক মিউজদের মন্দির।

**বাংলা অ্যাকাডেমির অভিমত** :- পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাডেমির 'অ্যাকাডেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' অনুসারে যে ঘরে নানা অত্যাশ্চর্য জিনিস বা প্রাচীন জিনিস সংরক্ষিত থাকে তাই হল জাদুঘর।

**আন্তর্জাতিক জাদুঘর পর্ষদের অভিমত** :—International Council of Museums বা ICON এর মতে, জাদুঘর হল অলাভজনক, জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত এবং স্থায়ী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষালাভ, জ্ঞানচর্চা ও আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে মানব ঐতিহ্যের স্পর্শযোগ্য ও স্পর্শতাযোগ্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করে। সংরক্ষণ করে প্রদর্শন করে এবং সেগুলি নিয়ে গবেষণা করে।

**এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা :**—এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা (Vol 8, Page 440) তে উল্লেখ আছে। মানুষের ইচ্ছায় নানা কৌতূহলোদ্দীপক সুন্দর সুন্দর বস্তু মিউজিয়াম বা যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

**সাধারণ সংজ্ঞা :** বস্তুত জাদুঘর হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের সংগ্রহশালা, যেখানে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প বিষয়ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংরক্ষণ করে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ? জাদুঘর হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা ভবন যেখানে অতীতের বহু বস্তুকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

**অতীত পুনর্গঠনে জাদুঘরের ভূমিকা :** অতীতকালের সময়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে জাদুঘরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যেমন –

**1. প্রত্ন নিদর্শন সংগ্রহ :** জাদুঘরের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল বিশ্বের হারিয়ে যাওয়া অতীত দিনের সমস্ত নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করে প্রত্ননিদর্শন কেন্দ্রিক বিষয়গুলির ধারণা দান করা।

**2. প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণ :** জাদুঘরগুলি সুপ্রাচীন অতীত দিনের প্রত্ননিদর্শনগুলি যেমন, প্রাচীন মুদ্রা, লিপি, ভাস্কর্য, মূর্তি, চিত্রকলা, দুষ্প্রাপ্য পুরাতাত্ত্বিক বস্তুসমূহ এবং বিভিন্ন মডেল চার্ট সংরক্ষণ করে থাকে।

3. **প্রতিকৃতি নির্মাণ :** অতীতদিনের যে নিদর্শনগুলি দুষ্প্রাপ্য অথচ মূল্যবান সেগুলির প্রতিকৃতি নির্মাণ, আধুনিক ঐতিহাসিক নিদর্শন বা ক্রিয়াকলাপ বা বস্তুসমূহের বা ব্যক্তিসমূহের মডেল (Replica) নির্মাণ করে জাদুঘরগুলি দর্শকদের দেখানোর জন্য সেগুলি সাজিয়ে রাখে।

4. **অতীত সমাজ সভ্যতার ধারণা দান :** বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ ও সভ্যতার যে অগ্রগতি ঘটেছে তার বিভিন্ন নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্নের আভাস মেলে জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শনগুলি থেকে।

5. **স্মরনীয় ব্যক্তিত্বদের সংগ্রহশালা নির্মাণ :** বিশ্বের বেশ কয়েকটি জাদুঘরকে বিশ্বের জনপ্রিয় ও স্মরনীয় ব্যক্তিত্বদের মূর্তির সংগ্রহশালা হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন, মাদাম তুসোর জাদুঘরটিতে রাজকীয় ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াতারকা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এমনকি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাদের মোমের মূর্তি সংরক্ষিত রয়েছে।

6. **জনসচেতনতা গঠন :** জাদুঘরে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক,বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রত্ননিদর্শনগুলি যেমন দর্শকদের মনে সচেতনতা আনে তেমন পন্ডিত, গবেষকরাও তাদের লেখার কাজে বা গবেষণার কাজে ব্যবহার করে থাকেন সেগুলি।

7. **জ্ঞানের প্রসার :** জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শনগুলির পাশে নানা ধরনের তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে সেই নিদর্শনগুলি সম্পর্কে। ফলে দর্শককুল ওই নির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায় ও জ্ঞানের প্রসার ঘটে।

8. **অতীত ইতিহাসের পুনরাবির্ভাবের সাহায্য :** জাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক নিদর্শন অতীত ইতিহাসের পুনরার্বিভাবে সাহায্য করে। বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা এই সমস্ত নিদর্শনগুলি আমাদের ইতিহাসকে প্রানবন্ত করে তোলে।

বস্তুত অতীত দিনের নিদর্শনগুলি সাধারণ পাঠক, দর্শক ও গবেষকদের সামনে অজানাকে জানার, আচেনাকে চেনার, সেই বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ ও জ্ঞান লাভের মূর্তি প্রতীক হয়ে ওঠে যেগুলি জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে। তাই বলা যায় জাদুঘর অতীত ইতিহাসের পুনরার্বিভাবে সাহায্য করে থাকে।

**ii. সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝো? সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (3+5)**

উ: **সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা :** সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। এইচ. জি. ওয়েরনস-এর মতে, সাম্রাজ্যবাদ হল এক সচেতন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা। সি.ডি বার্নস-এর মতে সাম্রাজ্যবাদ হল বিভিন্ন দেশ ও জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া এক ধরনের আইন ও শাসনব্যবস্থা। চার্লস হজ-এর মতে, ''সাম্র্যাজ্যবাদ বলতে অন্য দেশের স্বাধীনতার ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়।'' সুম্যান এর মতে, বলপ্রয়োগ ও হিংসার

সাহায্যে কোনো দেশের ওপর বৈদেশিক শাসন চাপিয়ে দেওয়াকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। জুলিয়াস বনের মতে সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন, সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের এমন একটি নীতি যার দ্বারা একটি দেশ অন্য দেশকে অধীনস্থ করে। পামার ও পরকিনসের মতে সাম্রাজ্যবাদ হল এমন একটি সম্পর্ক যার মাধ্যমে কোনো এলাকা বা তার জনগণ অন্য এলাকা বা জনগণের বা অন্য সরকারের অধীন হয়।

ভি. আই. লেনিন তাঁর 'Imperialism– the Highest stage of Capitalism' গ্রন্থে লিখেছেন, সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্যায়। ''জন. এ. হবসন'' তাঁর 'Imperialism-A Study' গ্রন্থে বলেছেন। প্রাথমিক স্তরে জাতীয়তা বোধ অন্য দেশে উপনিবেশ গড়ে তোলার প্রেরণা জোগায় যা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের রূপ নেয়। তিনি আরও বলেন 'বাড়তি মূলধনের চাপ'ই সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ। হিলফারডিঙ বলেন, সাম্রাজ্যবাদ হল একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী ব্যবস্থা। চার্লস ফাউৎস্কির মতে, সাম্রাজ্যবাদ হল অতি উন্নত পর্যায়ের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের ফল।

বস্তুত: সাম্রাজ্যবাদ হল সামরিক কর্তৃত্ব। আবার সাম্রাজ্যবাদ হল একটি দেশ নিজস্বার্থে অন্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করে সেই দেশ ও জাতির ওপর কর্তৃত্ব করার প্রবণতা।

**সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের কারণ :** অধ্যাপক জেমস জোল মনে করেন যে, সম্ভবত কোনো একটি অভিমত সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের কারণ ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। এর জন্য বিভিন্ন কারণকেই দায়ী করা যায়। এর পেছনে যে কারনগুলি বর্তমান সেগুলি হল (i) সামাজিক কারণ, (ii) অর্থনৈতিক কারণ (iii) রাজনৈতিক কারণ (iv) সামরিক কারণ (v) ধর্মীয় কারণ ও (vi) প্রযুক্তিগত কারণ।

**সামাজিক কারন :** উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি সামাজিক কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (ii) সভ্যতার প্রসার।

(i) উনবিংশ শতকের শেষদিকে ইউরোপের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বর্ধিত জনসংখ্যার বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ বিস্তারে উদ্যোগ নেয়। যেমন, 'বাঁচার মত স্থান' তত্ত্ব প্রচার করে হিটলার উপনিবেশ স্থাপনের নীতিকে বৈধতা দেন।

(ii) ইউরোপের অনেক সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদ মনে করতেন যে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত মানুষের প্রতি ইউরোপের 'সাদা চামড়ার মানুষদের' কিছু 'দায়বদ্ধতা' আছে। তথাকথিত এই দায়বদ্ধতা 'White man's burden' নামে পরিচিত। প্রখ্যাত ফরাসি লেখক জুলি ফেরি মনে করেন, অনুন্নত জাতিগুলিকে সভ্য করে তোলা উন্নত জাতিগুলির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। রুডইয়ার্ড কিপলিং সাদাচামড়ার মানুষকে অনুন্নত জাতিগুলির উন্নতির দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানায়। এর ফলে উদ্যমী শাসকরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উন্নতি সাধনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন।

**অর্থনৈতিক কারণ :** সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে অর্থনৈতিক কারণগুলি হল (i) পণ্য বিক্রির বাজার (ii) কাঁচামাল সংগ্রহ (iii) পুঁজি বিনিয়োগ এবং (iv) শ্রমিক সংগ্রহ।

(i) ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নিজ দেশের চাহিদা মেটানোর পর পণ্য উদ্‌বৃত্ত হত। এই উদ্‌বৃত্ত পণ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য ইউরোপের দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত দেশের বাজার দখলের চেষ্টা চালায়। (ii) ইউরোপীয় যে সমস্ত কারখানায় নিয়মিত প্রচুর পরিমাণ কাঁচামালের প্রয়োজন হয় সেখানে বিপুল পরিমাণ কাঁচামালের জোগান নিজ দেশ থেকে সম্ভব হত না। ফলে কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় দেশগুলি সুকৌশলে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। (iii) হবসন ও লেনিন দেখিয়েছেন যে শিল্পোন্নত দেশগুলির পুঁজিপতিদের বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জনের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে তাঁদের পুঁজি বিনিয়োগ বেশি আগ্রহী ছিল। (iv) ইউরোপীয় শিল্পোন্নত দেশগুলির কারখানায় বেশি উৎপাদন, মূলধন সংগ্রহের জন্য কায়িক শ্রমের সস্তায় প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। শিল্পোন্নত দেশগুলি ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ বিস্তার করে সেখান থেকে সস্তায় প্রচুর শ্রমিকের জোগান অব্যাহত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

**রাজনৈতিক কারণ :** সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (i) উগ্রজাতীয়তাবাদ (ii) ক্ষমতার আকাঙ্খা।

(i) 1870 এর পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উগ্রজাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রতিটি জাতিই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠে। প্রতিটি জাতির পারস্পরিক বিরোধ ও সন্দেহ যুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে।

(ii) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের সম্মান প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতালি, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। ইতালি ও রাশিয়ার কোনো উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন না থাকলেও অথবা ফ্রান্স ও বেলজিয়াম শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে তারা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে।

**সামরিক কারণ:** সাম্রাজ্যবাদ প্রসারে সামরিক কারণগুলি হল (i) সামরিক মর্যাদা বৃদ্ধি (ii) নিরাপত্তা বৃদ্ধির চেষ্টা।

(i) ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেদের সামরিক শক্তি ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্য উপনিবেশ স্থাপনের পথ বেছে নেয়। ইতালি ও ফ্রান্স নিজেদের জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যথাক্রমে লিবিয়া ও আফ্রিকায় অভিযান চালায়।

(ii) ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিদ্বেষ বৃদ্ধির ফলে নিজেদের নিরাপত্তার অভাববোধ করতে থাকে। নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ও নৌঘাঁটি স্থাপন করতে থাকে এবং সেগুলিকে বানিজ্যকেন্দ্র ও বিনেয়োগ ক্ষেত্রের হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। যেমন, ইংল্যান্ড নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সাইপ্রাস ও কেপের মতো নৌঘাঁট দখল করেছিল।

**ধর্মীয় কারণ :** সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে ধর্মের বিশেষ ভূমিকা ছিল। (i) ইউরোপের খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ মানবকল্যাণ ও নিপীড়িত জনগণের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলিতে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এবিষয়ে স্কট মিশনারি ড: ডেভিড লিভিংস্টোন ও ফরাসি মিশনারিরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

(ii) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকগণ ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত জাতিগুলিকে আলোর জগতে আনার চেষ্টা চালান। ফরাসি মিশনারি স্ট্যানলি ও কার্ডিনাল লোভিজোর এবং ইংল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মিশনারিরা এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। এই ধর্ম প্রচারকদের অনুসরন করে ইউরোপীয় স্বার্থান্বেষী বণিক ও রাজনীতিকরা এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রবেশ করে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়।

**প্রযুক্তিগত কারণ:** সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দায়ী ছিল বলে অনেকে মনে করেন। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, যন্ত্রচালিত যান ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের অভিযান স্পৃহা বাড়িয়েছিল। ব্রিটিশ নেভি লিগ, জার্মান নেভি লীগ উপনিবেশ স্থাপনের জন্য নিজেদের দেশকে চাপ সৃষ্টি করত।

**iii. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (8)**

উ: ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

**পাঁচসালা ও একসালা ব্যবস্থা:** ওয়ারেন হেস্টিংস 1772-1772 খ্রি: পর্যন্ত পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেছিলেন। প্রতিটি জেলায় ঘুরে নিলামের মাধ্যমে পাঁচ বছরের জন্য জমি বন্টনের জন্য ভ্রাম্যমান কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। 1773 খ্রি: 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' দ্বারা রাজস্ব ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আনা হয়। পাঁচসালা বন্দোবস্তের কিছু অসুবিধা দেখে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই 1775 খ্রি: এই ব্যবস্থা ভেঙে 'একসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করা হয়। 1776 খ্রি:'আমিনি কমিশন' নিয়োগ করা হয়। পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্ত কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেনি। জমির উন্নতির কথা না ভেবে রাজস্বে বেশি মনোযোগী হওয়ায় ক্ষতি হয় রায়ত ও কোম্পানির। কারণ জমিদাররা রায়তদের কাছে খাজনা আদায় করলেও তারা কোম্পানির রাজস্ব না দিয়ে পালিয়ে যেত।

**চিরস্থায়ী ব্যবস্থা :** 1793 খ্রি: 22 মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও বেনারসে প্রবর্তন করেন। মূলত জমিদার ও কোম্পানির মধ্যে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠে বলে এটি জমিদারি বন্দোবস্ত নামেও পরিচিত ছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে শর্তগুলি ছিল (i) নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমিদাররা জমির সত্ত্ব বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ করতে পারত। (ii) নির্দিষ্ট দিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে খাজনা মিটিয়ে দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হত। (iii) বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে শস্যহানি ঘটলেও কৃষকদের খাজনা মুকুব করা হত না। (iv) কৃষকদের দেয় রাজস্বের হার সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কিছু উদ্দেশ্য ছিল। (i) নির্দিষ্ট হারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব পেলে কোম্পানির আয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবে। (ii) জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলে জমিদার জমির উন্নতি সাধনে ও উৎপাদন বাড়াতে নজর দেবে। (iii) জমিদারি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ভারতের একটি অভিজাত গোষ্ঠী গড়ে উঠবে যারা হবে ইংরেজদের অনুগত।

**রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত :** 1820 খ্রি: স্যার টমাস মুনরো ও ক্যাপটেন আলেকজান্ডার রীড মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু অংশ ছাড়া সমগ্র দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে এই ব্যাবস্থা চালু করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সরকার সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করে। এজন্য এটি রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত বা রাইয়াতি ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

এই ব্যবস্থার মূল কথা হল (i) জমি জরিপের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। (ii) উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী জমিকে 9 টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। (iii) ভূমিরাজস্বের হার 35% থেকে 65% পর্যন্ত ধার্য করা হয়। (iv) কুনবি কৃষকদের জমির ভোগ দখলি সত্ত্ব থাকলেও জমির মালিকানা সত্ত্ব ছিল সরকার বাহাদুরের হাতে। (v) কোনো মধ্যসত্ত্বভোগীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে এই ব্যবস্থা মুক্ত ছিল। (vi) ধার্য রাজস্বের হার পরিবর্তন, পরিবর্ধন 20 বা 30 বছর পর হবে স্থির করা হয়।

**মহলওয়ারি বন্দোবস্ত :** গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ও মধ্যভারতে বেশ কিছু অঞ্চলে যেখানে জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম সেখানে 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সচিব ম্যাকেনজি 1819 খ্রি: একটি সমীক্ষা চালান। তারপর 1822 খ্রি: রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জমিবন্দোবস্ত গড়ে তোলেন যা মহলওয়ারি বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।

এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল–

(i) কৃষকদের সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত না করে সরকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। (ii) 30 বছর অন্তর জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হত। (iii) প্রত্যেক গ্রামের

রাজস্বের পরিমান সর্বমোট হিসাব ধার্য করে তা গ্রামের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির উপর রাখা হত। (iv) এখানে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্য করা হত।

**ভাইয়াচারি ও গ্রামওয়ারি ব্যবস্থা :** 1824 খ্রি: এলফিনস্টোন ও ম্যাকেনঞ্জির প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবে কয়েকটি মহল বা গ্রাম নিয়ে যৌথভাবে ভাইয়াচারি ও গ্রামওয়ারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। কয়েক বছর অন্তর এই ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্বের হার নির্ধারন করা হত। গ্রামের কোনো মোড়ল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হলে ঐ ব্যক্তি সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা দিত।

**তালুকদারি ব্যবস্থা :** অযোধ্যা 1856 খ্রি: ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মহলওয়ারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর অযোধ্যা এই ব্যবস্থার বাইরে থেকে গিয়েছিল। গুবিনস এখানে তালুকদারি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

**ফলাফল :** রজনীপাম দত্তের মতে, নতুন ভূমিরাজস্ব নীতির ফলে একদিকে যেমন জমিদার ও সরকার লাভবান হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় – (i) সুফল (ii) কুফল।

**সুফল :** (i) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের অবস্থার উন্নতি হয় ও সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। (ii) কৃষকরা জমি থেকে উৎখাতের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পায়। (iii) কৃষির উন্নতি হয় ও ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এতে ভারত শাসনে ব্রিটিশদের আরও সুবিধা হয়।

**কুফল :** ঐতিহাসিক হোমস্ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে একটি ঐতিহাসিক ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক-এর কুফলগুলি উল্লেখ করেছেন। যেমন (i) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির স্থায়ী মালিকানা দেওয়া হলেও কৃষকদের কোনো অধিকার ছিল না। ফলে তাদের জমি থেকে উৎখাতের ভয় থেকেই যায়। (ii) কোনো কোনো পন্ডিত কৃষিজমির উন্নতি হয়েছিল মনে করলেও বাস্তবে তা হয়নি। (iii) জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে বেশি অর্থ আদায় করলেও সরকারকে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থই প্রদান করতো। সরকার-এই উদ্‌বৃত অর্থ পেত না। (iv) জমিদাররা কৃষকদের বাড়তি করের বোঝা চাপালে কৃষকদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। (v) সূর্যাস্ত আইনের ফলে বহু পুরোনো জমিদার নির্দিষ্ট দিনে খাজনা জমা না দিতে পেরে উৎখাত হয় (vi) নতুন একশ্রেণির ভুঁইফোড় জমিদার শ্রেণির উদ্ভব হয় যারা কৃষির উন্নতি না করে শহরে বিলাস ব্যসনে দিনযাপন করত। (vii) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কুটির শিল্প ও বানিজ্যে ব্যাপক ক্ষতি হয়। (viii) এই ব্যবস্থায় বহু মধ্যস্বত্বভোগী যেমন পাওনাদার, দর পত্তনিদার, দরদর পত্তনিদার প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

রায়তওয়ারি বন্দোবস্তে অতিষ্ট হয়ে দক্ষিণের কর্নাট কৃষকরা 1876 খ্রি: দক্ষিণাত্য কৃষক বিদ্রোহ করে। মারাঠা ও গুজরাট সাউকার মহাজনদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কৃষক

বিদ্রোহ হয়। দাক্ষিণাত্য দাঙ্গায় বেশ কিছু হতাহতের পর সরকার 1879 খ্রি: দাক্ষিণাত্য কৃষি আইন পাশ করে।

মহলওয়ারি বন্দোবস্তে কৃষকদের করের বোঝা এত বেশি ছিল যে গ্রামোন্নয়ন ও গ্রাম্য সম্পত্তি সঞ্চয়ের পথও বন্ধ হয়ে যায়। এই ব্যবস্থার ফলে সরকারি কর্মচারীদের শোষণ আরও বৃদ্ধি পায়। সরকার যেহেতু জমির মালিক তাই কৃষকদের জমি থেকে উৎখাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

1860 খ্রি: দু:খের সময় সমগ্র উত্তর ভারতে তালুকদারি ব্যবস্থার কুপ্রভাব লক্ষ করা যায়।

**অথবা**

**চীনের উপর আরোপিত বিভিন্ন অসম চুক্তিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। 8**

উ: চীনে কিং বংশের রাজত্বকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি বহিরাগতশক্তিগুলি চীনকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং চীনের ওপর বিভিন্ন শোষণমূলক চুক্তি চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তিগুলি সাধারণভাবে অসমচুক্তি নামে পরিচিত। মোটামুটিভাবে 1839 খ্রি: থেকে 1949 খ্রি: পর্যন্ত চীনের সঙ্গে এর শোষণমূলক আচরণ চলতে থাকায় এই চুক্তিগুলিকে চীনের 'শতাব্দীব্যাপী অবমাননা' বলে চিহ্নিত করা হয়।

**অসম চুক্তিগুলির বৈশিষ্ট্য :** অসম চুক্তিগুলির কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (i) বিদেশি শক্তিগুলির কাছে পরাজিত চীন যে অসম চুক্তিগুলি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় সেগুলি ছিল একতরফা চুক্তি। (ii) বিদেশি শক্তিগুলি অসম চুক্তিগুলির মাধ্যমে চীনে তাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। (iii) পশ্চিমি শক্তিগুলি অসমচুক্তির মাধ্যমে চীনের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করে। (iv) বিভিন্নযুদ্ধে পরাজিত চীন যুদ্ধের জন্য একাই দায়ী ছিল না কিছু তা সত্ত্বেও পশ্চিমি শক্তিগুলি চীনের ওপর বিপুল পরিমান অর্থ ও সম্পদ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবি করে। (v) বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অসমচুক্তিগুলির মাধ্যমে চীনে বানিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায় করে।

**বিভিন্ন অসম চুক্তি :** চীনের ওপর আরোপিত বিভিন্ন অসম চুক্তিগুলি হল–

**নানকিং –এর অসম চুক্তি :** প্রথম আফিমের যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে চীন পরাজয়ের পর নানকিং–এর অসমচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় (29 আগস্ট, 1824 খ্রি:)। এই সন্ধির দ্বারা (i) চীনের পাঁচটি বন্দর–ক্যান্টন, সাংহাই, অ্যাময়, ফুচাও, নিংগপো ইউরোপীয় বনিকদের বানিজ্য ও বসবাসের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যা চুক্তিবন্দর নামে খ্যাত। (ii) এই বন্দরগুলিতে ইউরোপীয়রা নিজ নিজ কনসাল নিয়োগ করতে থাকে। (iii) হংকং বন্দর চিরকালের জন্য ইংরেজদের ছেড়ে দেওয়া হয় এবং চীনের সর্বত্র ইংরেজ বনিকদের পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার স্বীকৃত হয়। (iv) কোহং প্রথা বাতিল হয়। (v) চীনে ব্রিটিশ আমদানি-রপ্তানি পন্যের ওপর 5% শুল্ক ধার্য হয়। (vi) ক্যান্টন বন্দরে ইংরেজদের আফিম

ধ্বংস করার জন্য চীন সরকার ইংরেজদের 6 মিলিয়ন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ 12 মিলিয়ন এবং কোহং বণিকদের খান পরিকোত্বের জন্য 3 মিলিয়ন রোপ্য ডলার দিতে বাধ্য হয়।

**বগ–এর চুক্তি :** (1843 খ্রি: 8ই অক্টোবর বগ-এর চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার চীনের কাছ থেকে কিছু অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ কে। এই সন্ধির দ্বারা (i) চীনের 'চুক্তি বন্দর' গুলিতে বসবাসকারী চীনা ও ব্রিটিশ নাগরিকদের ওপর ব্রিটিশ আইন ও বিচারব্যবস্থা কার্যকর হবে। (ii) চীন সরকার অন্য বিদেশিদের যে সব সুযোগ সুবিধা দেবে ব্রিটেনকেও তা দিতে বাধ্য থাকবে।

**ওয়াংঘিয়ার অসম চুক্তি :** 1844 খ্রি: 3 জুলাই মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্র চীনের সঙ্গে ওয়াংঘিয়া চুক্তির মাধ্যমে চীনে বিভিন্ন অতিরাষ্ট্রিক সুবিধা লাভ করে।

**হোয়ামপোয়া-র অসম চুক্তি :** 1844 খ্রি: 24 অক্টোবর এই চুক্তি ফ্রান্স ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এর দ্বারা (i) ফরাসি বণিকরা চীনে নতুন পাঁচটি বানিজ্যের সুবিধা পায়। (ii) ফ্রান্স চীনে অতিরাষ্ট্রিক সুবিধা লাভা করে। (iii) চীন ও ফ্রান্সের মধ্যে বানিজ্য শুল্ক নির্দিষ্ট হয়।

**আইগুন–এর সন্ধি :** এই সন্ধি রাশিয়া ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এর দ্বারা (i) রাশিয়া চীনের উত্তরাংশের কিছু ভূখন্ডে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। (ii) আমুর, উসুরি ও সংখুয়াজিয়াং নদীতে রাশিয়া ও চীনের নৌচলাচল একমাত্র স্বীকৃত হয়।

**টিয়েনসিনের অসম চুক্তি :** দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধে পরাজয়ের পর চীনের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এই চুক্তি স্বাক্ষর করে (1858)। এই সন্ধির দ্বারা (i) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স চীনকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। (ii) বিদেশি বণিকদের জন্য আরও 11 টি বন্দর খুলে দেওয়া হয়। (iii) রাজধানী পিকিং–এ বিদেশি দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। (iv) বিদেশি ছাড়পত্রের মাধ্যমে অবাধ ভ্রমন ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের অধিকার লাভ করে। (v) বিদেশি বাণিকদের সুবিধার্থে বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করা হয়। (vi) চীনে আফিমের ব্যবসা বৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় শুল্কের বিনিময়ে। (vii) বিদেশি বণিকরা চীনে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে।

**পিকিং -এর সন্ধি :** টিয়েনসিনের সন্ধির শর্তগুলি যথেষ্ট ছিল না বলে ফ্রান্স ও ব্রিটেন মনে করে। এর ফলে তারা চীনের সঙ্গে 1860 খ্রি: পিকিং এর চুক্তি স্বাক্ষর করে আরও কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

শিমনোশেকি–র-সন্ধি : কোরিয়াকে কেন্দ্র করে চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হলে চীন জাপানের হাতে পরাজিত হয়ে। 1895 খ্রি: চীন শিমনোশোকি-র সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এর দ্বারা (i) চীন কোরিয়াকে স্বাধীনতা দানে বাধ্য হয়। (ii) চীনের কাছ থেকে জাপান পোর্ট আর্থার সহ বেশ কিছু উপদ্বীপ লাভ করে। (iii) চীন জাপানকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। (iv) জাপান চীনের বেশ কিছু বন্দরে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করে।

জাপানের চীনে প্রভাব বিস্তারকে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ভাল চোখে দেখেনি। তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ফলে জাপানকে তারা লিয়াও টুং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার চীনকে ফেরত দিতে বাধ্য করে। (i) ইউরোপীয় শক্তিগুলি চীনের বিভিন্ন কিইয়াং ও দক্ষিণ চীনে, (ii) জার্মানি শাংটুং, হ্যা কাও এবং টিয়েনসিনে (iii) রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ও বহিশদোলিয়ায় (iv) ফ্রান্স ইউনান, কোয়াংটুং তাবলে (v) জাপান ফুকিয়েন অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে 'চীন তরমুজকে খন্ডবিখন্ড করে দেয়।'

**বক্সার প্রোটোকল :** চীনে ইউরোপীয়দের শোষণ, নির্যাতন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে আই-হো-চুয়ান নামে একটি গুপ্ত সমিতি-বক্সার বিদ্রোহ শুরু করে (1899-1961 খ্রি:)। বিদ্রোহীরা বিদেশিদের হত্যা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, গীর্জা ধ্বংস করতে থাকে। এমনকি তারা বিদেশি দূতাবাসগুলি অবরোধ করে ও কর্মীদের উপর অত্যাচার শুরু করে। এতে বিদেশি শক্তিগুলি আতঙ্কিত হয়ে আটটি দেশের মিলিত বাহিনী বিদ্রোহ দমন করে। চীনা সাম্রাজ্ঞী জু-সি পাত্রমিত্র সহ পিকিং ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর 1901 খ্রি: 7 সেপ্টেম্বর 11টি বিদেশি শক্তি বক্সার প্রোটোকল নামে এক চুক্তির মাধ্যমে চীনের ওপর বিভিন্ন কঠোর নীতি চাপিয়ে দেয়।

বক্সার প্রোটোকলের শর্তানুসারে (i) বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত 12 জন রাজপুরুষকে প্রানদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং শতাধিক রাজপুরুষকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। (ii) চীনের 125টি রেলস্টেশন বিদেশি সেনাদের দখলে আসে এবং 25টি দুর্গ ভেঙে ফেলা হয়। (iii) পিকিংএ স্থায়ী বিদেশি সোনা মোতায়েন হয় বিদেশি দূতাবাস রক্ষার্থে। (iv) চীনে দু-বছরের জন্য অস্ত্রনির্মাণ ও আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। (v) বিদেশি বণিকদের কাছ থেকে 5% এর বেশি শুল্ক ধার্য করা হবে না বলা হয়।

1917 খ্রি: রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়া চীনের উপর থেকে সবরকমের সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে। 1928 খ্রি: পর থেকে চীন বিদেশিদের কাছ থেকে শুল্ক আদায়ে সক্ষম হয়। যদিওে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের মত শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি অন্তত: 1946 খ্রি: পর্যন্ত চীনের কাছ থেকে তাদের অধিরাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল। বস্তুত: চীনের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমেই ইংল্যান্ড 1997 খ্রি: হংকং এবং পোতুর্গাল 1999 খ্রি: ম্যাকাও এর দাবি ত্যাগ করে।

**(iv) চীনের চৌঠা মে (May Fourth) আন্দোলনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করো। এই আন্দোলনের প্রভাব আলোচনা কর। [4+4]**

উ: ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এক প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনে একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। এই সরকারের নানা কাজ-কর্মে চীনের সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া বিংশ শতকের শুরুতে চীনে বিদেশিদের আধিপত্য, বিদেশিদের চাপিয়ে দেওয়া বিভিন্ন অসম চুক্তি, বিদেশি পণ্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে দেশ প্রেমিক চীনাদের মতে ক্রমাগত ক্ষোভ

জমতে থাকে। যার ফলস্বরূপ চীনের জাতীয়তাবাদী ও বুদ্ধিজীবী মানুষেরা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ ৪ মে যে প্রতিবাদ আন্দোলনের আয়োজন করেছিল। বিভিন্ন কারণগুলি ছিলঃ

**ইউয়ান সি-কাই-এর নৃশংসতা :–** ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে চীনের সামগ্রিক নেতা ইউয়ান-সি-কাই রাষ্ট্রপতি হবার পর, চীনে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। সমস্ত সাংবিধানিক পদ্ধতি বাতিল করে তিনি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠিগুলির কাছ থেকে অপমানজনক শর্তে ঋণ নেওয়ার কথাবার্তা শুরু করে। যারা এর বিরোধিতা করেন তাদেরকে তিনি হত্যা করেন।

**কুয়োমিন তাং দল নিষিদ্ধ :–** ইউয়ান-সি-কাই-এর অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কুয়োমিন তাং দল ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের ডাক দিলে ইউয়ান-এর বাহিনী বিদ্রোহীদের কঠোর ভাবে দমন করতে সক্ষম হন এবং কুয়োমিন তাং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে চীনা জনগণের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়।

**একুশ দফা দাবির প্রতিবাদ :–** ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে জাপান চীনের শান্টুং প্রদেশ থেকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করে সেখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র চীনকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করতে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জাপান চীনের কাছে 'একুশ দফা দাবি' পেশ করে। চীনের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে এই দাবি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। একুশ দফা দাবির বিভিন্ন বিষয়গুলি চীনা সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশের ফলে চীনের মানুষ জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। একুশ দফা দাবির বিরোধিতায় চীনে, 'নাগরিকদের দেশপ্রেমী সমিতি' গড়ে ওঠে (১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে)। সাংহাই শহরে প্রতিষ্ঠিত 'জাপ-বিরোধী কমরেডদের জাতীয় সমিতি চীনে জাপানি পণ্য বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। একুশ দফা দাবির বিরুদ্ধে আমেরিকায় পাঠরত চীনের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

**ইউয়ান সি-কাই-এর গোপন চুক্তি :–** চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ইউয়ান সি-কাই চীনের সম্রাট পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁর জাপানের সঙ্গে করা গোপন চুক্তি এবং জাপানের চাপে বয়কট আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ (২৫ মার্চ) চীনে তীব্র জনরোষের সৃষ্টি হয়।

**বিদেশি পণ্যের বাজার :–** চীনের অভ্যন্তরে আবার জাপানসহ অন্যান্য পুঁজিপতি দেশগুলি বাজার দখলের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। ফলে চীনে নতুন গড়ে ওঠা শিল্পগুলি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং অস্তিত্বের সংকটে পড়ে যায়।

**প্রত্যক্ষ কারণ :–** প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করে এবং মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয় লাভ করার পর চীনের আশা ছিল বিদেশিদের কাছ থেকে চীন তার রাজ্যাংশগুলি ফেরত পাবে এবং বিদেশিদের সঙ্গে অসম চুক্তি বাতিল হবে। সে কারণে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীন জাপানের একুশ দফা দাবীসহ সব অসম চুক্তি এবং শান্টুং প্রদেশে জাপানি কর্তৃত্ব বাতিলের দাবি জানায়। কিন্তু ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ চীনের কথায় কর্ণপাত না করায় চীনের প্রতিনিধিরা শূন্য হাতে ফিরে আসে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে মিত্রশক্তি চীনের প্রতি অবিচার করলে চীনের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে. এই পরিস্থিতিতে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চেন-তু-শিউ-র ডাকে জাতীয়তাবোধ উদ্‌বুদ্ধ হাজার হাজার ছাত্র ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে পিকিং এর 'তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ার'এ সমবেত হয়ে বিক্ষোভ পদর্শন করে। ক্রমে সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দেয় চীনের ব্যবসায়ী সমিতি ও নানান প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা।

কর্মকান্ডের ব্যাপকতা ও গভীরতার বিচারে ৪ মে-র আন্দোলন ছিল চীনের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। চীনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব ছিল -

(১) **দেশাত্মবোধ ও আধুনিকতার উদ্ভব :** ৪ মে-র আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই চীনে আধুনিকতা, দেশপ্রেম, জাতিয়তাবোধের সূচনা হয়। জাতীয়তা শক্তিগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সমগ্র দেশ জুড়ে ঐক্যের ধারণা দৃঢ় হয়। প্রচীনত্বের অবসান ঘটিয়ে চীন দ্রুত আধুনীকরণের পথে অগ্রসর হয়। স্বাভাবিকভাবে এই আন্দোলন চীনে নবজাগরণের পথ। সুগম করেছিল।

(২) **সরকারের নতিস্বীকার :** ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে চীন সরকার নতিস্বীকারে বাধ্য হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয়ে ধৃত ছাত্রদের ছেড়ে দেয় ও ভার্সাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবে না বলে ঘোষণা করে (১৯১৯ খ্রি.)।

(৩) **কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা :** এই আন্দোলনের ফলেই চীনে কুয়োমিন তাং দলের পুনর্গঠন হয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান ঘটে। জঁ-শ্যেনো-র মতে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চীনের শ্রমিক শ্রেণি রাজনৈতিক সংগ্রামের আঙিনায় প্রবেশ করে।

(৪) **ব্যাপকতা :** ৪ মে র আন্দোলনের প্রভাব ছিল চীনের সর্বত্র এবং এর গণভিত্তি ছিল ব্যাপক।

(৫) **সাংস্কৃতিক অগ্রগতি :** চীনের বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই আন্দোলন এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। চীনে বহু বিপত্র ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হলে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে। চীনের পুরোনো কনফুসীয়াস মতাদর্শ সমালোচিত হতে থাকে এবং নতুন সংস্কৃতিকে সবাই স্বাগত জানায়।

চীনা ঐতিহাসিক হো-কান-চি-র মতে ৪ মে-র আন্দোলন নতুন বিপ্লবী ঝড়ের জন্ম দেয় এবং চীনের বিপ্লবকে এক নতুন স্তরে পৌঁছে দেয়।

## বিভাগ - খ

(v) **১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট ও শর্তাবলি আলোচনা করো। এই আইনের গুরুত্ব কী ছিল? [4+4]**

উ: **সূচনা :-** ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত গান্ধীজির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এদিকে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ব্রিটিশ সরকারকে ভরিয়ে তোলে। ফলে সরকার 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট' (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে), ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ও ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের 'ভারতের সংবিধানিক সংস্কারের জন্য প্রস্তাব সমূহ' নামে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। একটি যৌথ নির্বাচন কমিটির বিবেচনার পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর পাশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল পেশ করা হয়। এই বিলটি ১৯৩৫ খ্রিঃ আইনে পরিণত হয়, যা ১৯৩৫ খ্রিঃ ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত।

১৯৩৫ খ্রিঃ এই নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যগুলি হল–

(১) ১৯১৯ খ্রিঃ মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্খা পুরণে ব্যর্থ হলে গান্ধীজির নেতৃত্বে সারা ভারতে প্রবল গণআন্দোলন শুরু হয়।

(২) এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী কার্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবীদের অতি সক্রিয়তায় সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

(৩) ভারতে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের বৃদ্ধি ব্রিটিশ সরকারকে খুবই ভাবিয়ে তোলে। ফলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে।

(৪) ব্রিটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী নেতাদের সাংবিধানিক বেড়াজালে বাঁধতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই সময় সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুরক্ষিত করা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করা।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ভারত শাসন আইন পাস করে। এই আইন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের দুটি মূল কাঠামো ছিল - সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক বা প্রাদেশিক সরকার।

**কেন্দ্রীয় সরকার :–** ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে কেন্দ্রে একধরনের 'দ্বৈতশাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনের মাধ্যমে যে শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়, তা হল -

(১) ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করলে ওই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে বলে জানানো হয়।

(২) কেন্দ্রে পাঁচ বছর মেয়াদি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর নিম্নকক্ষ বা কেন্দ্রীয় আইনসভা (Federal Assembly) গঠিত হয় ৩৭৫ জন সদস্য নিয়ে, যার মধ্যে ১২৫ জন সদস্য দেশীয় রাজগুলির প্রতিনিধি। আর উচ্চকক্ষ (Council of States) গঠিত হয় ২৬০ জন সদস্য নিয়ে, যার মধ্যে ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি।

(৩) মুসলিম সম্প্রদায়, তপশিলি সম্প্রদায়, শিখ, খ্রিস্টান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) কেন্দ্রীয় শাসনের বিষয়গুলিকে 'সংরক্ষিত' এবং 'হস্তান্তরিত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন

সংরক্ষিত বিষয় :- দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, সৈন্যদল, মুদ্রা ও মুদ্রানীতি, ধর্মসংক্রান্ত বিষয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল গর্ভনর জেনারেলের উপর।

হস্তান্তরিত বিষয় :- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতি পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে।

(৫) গভর্নর জেনারেল শাসন পরিচালনার বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ উপেক্ষা করার এবং তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পান। এছাড়া তার হাতে কিছু 'স্বেচ্ছাসেবী ক্ষমতা' ও 'স্ববিবেচনা প্রসূত ক্ষমতা ছিল। তিনি তার কাজের জন্য সরাসরি ভারত সচিব ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।

(৬) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের উদ্দেশ্যে তিনটি পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়। এগুলি হল -

(i) **কেন্দ্রীয় তালিকা :** এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সামরিক বিভাগ, বিদেশ নীতি, রেল, ডাক, মুদ্রা প্রভৃতি।

(ii) **প্রাদেশিক তালিকা :** এর অন্তর্ভুক্ত ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পুলিশ প্রভৃতি।

(iii) **যুগ্ম তালিকা :** এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সংবাদপত্র, মুদ্রণ, দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন, বোবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি।

**প্রাদেশিক সরকার :–** গভর্নর শাসিত প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে স্বায়ত্ত শাসনের পরিকল্পনা করা হয়, যার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল -

(১) গভর্নর এবং একটি বা দুটি কক্ষ নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হবে।

(২) আইনসভাগুলির মেয়াদ পাঁচ বছর করা হয়।

(৩)আইনসভা ও আইন পরিষদ আহ্বান করা বা ভেঙে ফেলার অধিকার গভর্নরকে দেওয়া হয়।

(৪) আইনসভা আইন প্রণয়ন করলেও তা গভর্নরের সম্মতি ছাড়া আইনে পরিনত হবে না।

(৫) প্রতিটি প্রদেশে গভর্নরের অধীনে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকতেন।

(৬) প্রদেশগুলিতেও সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

**গুরুত্ব :-** বিভিন্ন ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য -

(১) এই আইন স্বাধীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

(২) প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত্বশাসন নীতি কার্যকর হয়।

(৩) ১৯৩৫ এর ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রথমবার ১৯৩৭ সালে সরাসরি নিবার্চন উপস্থাপন করা হয়।

(৪) স্বাধীন ভারতের সংবিধানের কাঠামোটি ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। এই আইনের মাধ্যমে প্রদেশগুলির স্বায়ত্ত শাসনের কিছু অধিকার ভারতীয়রা পায়

তবে সব দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, এই আইনে দেশবাসীকে ক্ষমতা দেওয়া। অপেক্ষা ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকারই বেশি দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে জওহরলাল নেহরু এই আইনকে একটি মোটর গাড়ির সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, ''A machine with strong brake and no engine."

(vi) **জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রেক্ষাপট কী ছিল? এই ঘটনার গুরুত্ব আলোচনা কর।** **[4+4]**

উ: প্রেক্ষাপট ও অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন দমনমূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলন ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। এর কারণগুলি হল -

(১) **অত্যাচারের তীব্রতা বৃদ্ধি :–** পাঞ্জাবের মুখ্য প্রশাসক লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার-এর অত্যাচারী শাসন পাঞ্জাবকে বারুদের স্তূপে পরিণত করে। জুলুম চালিয়ে যুদ্ধের জন্য পাঞ্জাব থেকে সেনা ও অর্থ সংগ্রহ, 'গদর' বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে পাঞ্জাবিদের উপর

চরম নির্যাতন চালানো, বঞ্চনার প্রতিবাদে বেকার শিখ সৈন্যদের সমাবেশ প্রভৃতি ঘটনা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের মানুষকে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে।

(২) **রাওলাট আইনের প্রয়োগ :–** সরকার ভারতীয়দের যাবতীয় স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুর দমনমূলক রাওলাট আইন প্রবর্তন করলে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে এই বিক্ষোভ পাঞ্জবে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

(৩) **নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার :–** 'পিপল্‌স কমিটি' নামে একটি গণসংগঠন লাহোর ও অমৃতসরে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল অমৃতসরের স্থানীয় দুই নেতা সৈফুদ্দিন কিচলু ও ড. সত্যপাল-কে হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করলে জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে লাহোর স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। মারমুখী জনতা বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালত, টেলিগ্রাফ লাইন, ইউরোপীয় নারী পুরুষের উপর আক্রমণ চালায়।

(৪) **অমৃতসরে সামরিক শাসন জারি :–** অমৃতসরে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে জেনারেল মাইকেল ও ডায়ার-এর নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর হাতে পাঞ্জাবের শাসনভার তুলে দেওয়া হয়। সামরিক আইন জারি করে ১১ এপ্রিল শহরে জনসভা ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রায় ১০,০০০ জনতা সমবেত হয়েছিল।

পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকর্তা মাইকেল ও ডায়ার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং মাঠের ওই প্রবেশ পথ আটকে ৫০টি রাইফেল থেকে জনগণকে কোনোরকম সতর্ক বার্তা না দিয়ে সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলি করার নির্দেশ দেন।

**গুরুত্ব :–** জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়ানক ও মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের ঘটনায় ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত নগ্ন রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই হত্যাকান্ডের ঘটনায় সারা বিশ্ব শিহরিত হয়। দেশ-বিদেশে সর্বত্রই নগ্ন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই নির্মমতার প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন, ''একটা সময় এসেছে যখন সম্মানসূচক চিহ্নগুলি আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে আমি সকল মর্যাদামুক্ত হয়ে আমার দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই।'' রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ ঘটনা ভারতবর্ষে এক মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছে।'' গান্ধীজি তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় লেখেন, ''এই শয়তান সরকারের সংশোধন সম্ভব নয়, একে ধ্বংস করতেই হবে। (This Satanic Government can not be mended– it must be

ended) ''ভারতবন্ধু সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা মহাদেব দেশাইকে একটি চিঠিতে লেখেন ''এটি একটি গণহত্যা - একটি কসাইখানা (It was a massacre - a butchery)।"

(vii) **জোট নিরপেক্ষ নীতি কী ছিল ? জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য আলোচনা করো।** **[4+4]**

উ : **জোট নিরপেক্ষ নীতি :–** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গোটা বিশ্ব পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র জোটে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় ঠান্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ এই দুটি বিবাদমান জোটের কোনোটিতেই যোগ না দিয়ে সব দেশের সঙ্গেই বন্ধুত্ব বা সমদূরত্ব বজায় রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার যে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে, তাকে জোট নিরপেক্ষ নীতি বলা হয়। জোট নিরপেক্ষ নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জে. ডব্লিউ বার্টন বলেছেন, ''জোট নিরপেক্ষতা বলতে বোঝায় সমাজতান্ত্রিক জোট ও ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে দূরে সরে তেকে বিদেশনীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করা।" পশ্চিমি ভাষ্যকররা, - দুই শক্তিজোট থেকে বন্ধুত্ব বা সমদূরত্বের নীতি গ্রহণকে নির্জোট ব্যবস্থা বলে থাকেন। আবার অনেকেই বলেন, জোট নিরপেক্ষ বা নির্জোট আন্দোলন ছিল ঠান্ডা লড়াইয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের রূপকার ও প্রথম প্রবক্তা জওহরলাল নেহরু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, - ''জোট নিরপেক্ষতার অর্থ বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে নির্লিপ্ততা নয়, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধবাদী অশুভ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাকে মর্যাদা দিতে উন্নত বিশ্বকে বাধ্য করা।" তিনি মনে করতেন, সামরিক জোট প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বে শান্তি আনা যায় না, বরং সামরিক জোট যুদ্ধ সৃষ্টি করে। স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন নীতি গ্রহণ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল নেহরুর প্রধান লক্ষ্য। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু প্রবর্তিত জোট নিরপেক্ষতার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল -

(১) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ।

(২) উপনিবেশ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরোধীতা করা।

(৩) দীর্ঘ দু-শো বছর ব্রিটিশ শোষণে নিঃস্ব-রিক্ত এবং দেশ ভাগের পরবর্তী বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাৎপদতার অবসানের জন্য ভারতের পক্ষে নির্জোট ও শান্তির নীতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

(৪) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি ও জঙ্গিবাদীতার পরিবর্তে পারস্পরিক আলাপ জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

(৫) ভারতের জোট নিরপেক্ষতার মধ্যে আর একটি উদ্দেশ্য হল চিরন্তন আবেগকে ধরে রাখা। সেখানে রুশ সাম্যবাদ বা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ও মার্কিন পুঁজিবাদের জায়গা নেই।

ভারত বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ধীরে ধীরে সমাধান সুত্র খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জোট নিরপেক্ষতার কথা ভেবেছিল।

**অথবা**

**ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝায়? ঠান্ডা লড়াই-এর তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করো। [3+5]**

উ : ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভাবদর্শগত দিক থেকে সমগ্র পৃথিবী দুটি শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক বা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট। অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রজোট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দুটি রাষ্ট্রজোট সমগ্র পৃথিবীতে নিজেদের সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তা ঠান্ডা লড়াই নামে খ্যাত। কারণ এই লড়াই কোনো সশস্ত্র লড়াই ছিল না। এটি ছিল এক ভাবাদর্শগত বা মতাদর্শগত লড়াই এবং তা কেবলমাত্র কূটনৈতিক স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

**ঠান্ডা লড়াই - এর তাত্ত্বিক ভিত্তি / উদ্ভবের কারণ :**—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রজোটের মধ্যে সংগঠিত ঠান্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা একত্রে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নামে পরিচিত। এগুলি হল -

[১] ঐতিহ্যবাহী বা রক্ষণশীল ব্যাখ্যা ঃ- এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধ ছিল আদর্শগত বিরোধ এবং এর জন্য দায়ী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাম্যবাদী আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ইউনস্টোন চার্চিল তাঁর 'The Second World War", হার্বাট ফিস তাঁর 'Churchill, Roosevelt and Stalin' এবং জর্জ কেন্নান তাঁর American Diplomacy" গ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের মূল বক্তব্য হল, সোভিয়েত ইউনিয়নের উগ্র সম্প্রসারণ নীতির জন্য পৃথিবীতে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র শক্তির মতামত উপেক্ষা করে শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব ইউরোপের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। রক্ষনশীল ব্যাখাকাররা আরও বলেন, স্টালিন কমিনফর্ম গঠনের মাধ্যমে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বামপন্থী অভ্যুত্থানে গোপনে মদত জুগিয়ে এবং ফ্রান্স, ইটালি ইত্যাদি রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দলকে জঙ্গি পথের দিশা দেখিয়ে পশ্চিমি দুনিয়ায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেন। এভাবেই রাশিয়া ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

[২] **সংশোধনকারী ব্যাখ্যা :-** এই মতের সমর্থকগণের (ব্যাখ্যাকাররা) মনে করেন - 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারনশীল নীতি নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতি ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছিল।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিহত করতে না পেরে নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চলের সম্প্রসারণ ঘটাতে শুরু করে ও ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ওয়াল্টার লিপম্যান, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'The Cold War" গ্রন্থের জর্জ এফ. কেন্নান-এর সোভিয়েত বিরোধী বেষ্টনী তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন, ''পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত সম্প্রসারণে বাধা দান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠান্ডা লড়াই ডেকে আনে।"

[৩] **বাস্তববাদী ব্যাখ্যা :-** একদল ঐতিহাসিক আদর্শগত এবং সংশোধনবাদী তত্ত্বের অবস্থান গ্রহণ করে ঠান্ডা লড়াইয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা মনে করেন যে, ঠান্ডা লড়াইয়ের জন্য দুই পক্ষই দায়ী ছিল অথবা কোনো পক্ষই দায়ী ছিল না। তাদের এই ব্যাখ্যা বাস্তববাদী ব্যাখ্যা নামে পরিচিত। এই মতের সমর্থক মরগ্যানথো দেখিয়েছেন জে, রুশ সম্প্রসারণ নীতি ও সাম্যবাদী আদর্শকে একই দৃষ্টিতে দেখে আমেরিকা অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

[৪] **অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যাখ্যা :-** এই মতবাদের ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন যে, 'ঠান্ডা লড়াই ছিল প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের অন্যতম দিক। গ্যাব্রিয়েল কলকো দেখিয়েছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান চালকের আসন লাভের চেষ্টা করে। এই লক্ষ্যে আমেরিকা তার বিদেশনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে মার্শল পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপে নিজেকে পরিত্রাতা হিসাবে তুলে ধরার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান বাধা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এইজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার অনুগত রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আমেরিকা একপ্রকার ক্রুসেড ঘোষণা করে। এর ফলেই ঠান্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটে।

বাস্তব এই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যে ঠান্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবে অনুঘটকের কাজ করেছিল - তা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়।

(viii)**সার্ক কীভাবে গঠিত হয়েছিল ? সার্ক-এর উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল ?** **[4+4]**

উ: **SAARC প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ঃ–** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে অন্যতম ঐতিহাসিক ঘটনা হল ১৯৮০ এর দশকে সার্ক-এর প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এবং অব-ঔপনিবেশিকরণের সূচনা থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যে আন্দোলন চলে আসছে, সার্ক-এর প্রতিষ্ঠা সেখানে একটি স্থায়ী মাইলস্টোন হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট Association of South - East AsianNations প্রতিষ্ঠা ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, যে কারণে তারা আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনে

উৎসাহী হয়েছিল। আর এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেন স্বাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনি চেয়েছিলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদানপ্রদান ও যোগাযোগ সুদৃঢ় ও সহজলোভ্য করার মধ্যে একে অপরের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক। জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণ-এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের বিদেশমন্ত্রীগণ পরবর্তী কয়েক বছরে কলম্বো (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ), কাঠমাণ্ডু (১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ), ইসলামাবাদ (১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ), ঢাকা (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রভৃতি স্থানে একাধিকবার মিলিত হন। অবশেষে এইসব দেশের বিদেশমন্ত্রীরা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি সম্মেলনে সমবেত হয়ে South Asian Association for Regional Cooperation বা সার্ক গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

অবশেষে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৭-৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই ৭টি দেশের শীর্ষনেতাদের নিয়ে এক শীর্ষ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি হোসেন মহম্মদ এরশাদ সার্কের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সার্কের প্রথম মহাসচিব নিযুক্ত হন বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ আবুল আহসান।

**সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ- সার্কের সনদে ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি ছিল -**

[১]উন্নয়ণ : সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়ণ ঘটানো।

[২] জনকল্যাণ : দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণসাধন এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো।

[৩] বোঝাপড়া : সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া ও সংবেদনশীলতার পরিবেশ তৈরি হয়।

[৪] আত্মনির্ভরতা : সার্কের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষা এবং যৌথ আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলা।

[৫] অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা : সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষা করা এবং কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

[৬] নিরাপত্তা : দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সন্ত্রাসবাদকে প্রতিরোধ করা।

[৭] আর্থসামাজিক আদানপ্রদান : সামাজিক অর্থনৈতিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

[৮] সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান : সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটানো।

## বিভাগ -খ

**1. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 24 = 24$**

**(i) ''সব ইতিহাসই সমকালীন ইতিহাস'' — এটি কার উক্তি?**

(a) ক্রোচের (b) র‍্যাঙ্কের

(c) র‍্যালের (d) ই. এইচ. কার

**উঃ (a) ক্রোচের**

**(ii) রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন**

(a) কৌটিল্য (b) কলহন

(c) বিলহন (d) কালিদাস।

**উঃ (b) কলহন**

**(iii) পর্তুগীজরা 'ব্ল্যাক গোল্ড' বলতো**

(a) কয়লাকে (b) গোলমরিচকে

(c) লবঙ্গকে (d) দারুচিনিকে

**উঃ (b) গোলমরিচকে**

**(iv) ভারতে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় ..... সালে।**

(a) 1784 (b) 1774

(c) 1798 (d) 1874

**উঃ (a) 1784**

**(v) ভারতের কোন রাজ্যে প্রথম ইংরেজরা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে?**

(a) বোম্বে (b) গুজরাট

(c) মাদ্রাজ (d) বাংলা

**উঃ (d) বাংলা**

**(vi) স্তম্ভ-১ এর সাথে স্তম্ভ-২ মেলাও :**

| স্তম্ভ-১ | স্তম্ভ-২ |
|---|---|
| (i) ফারুকশিয়ারের ফরমান | (A) 1773 |
| (ii) পিটের ভারত শাসন আইন | (B) 1717 |
| (iii) রেগুলেটিং আইন | (C) 1765 |
| (iv) কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ | (D) 1784 |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-B, (ii)-D, (iii)-A, (iv)-C (b) (i)-C, (ii)-B, (iii)-D, (iv)-A

(c) (i)-D, (ii)-C, (iii)-A, (iv)-B (d) (i)-A, (ii)-B, (iii)-C, (iv)-D.

**উঃ (a) (i)-B, (ii)-D, (iii)-A, (iv)-C**

**(vii) নানকিং-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল**

(a) 1839 খ্রিঃ (b) 1841 খ্রিঃ

(c) 1843 খ্রিঃ (d) 1845 খ্রিঃ

**উঃ (b) 1841 খ্রিঃ**

**(viii) 'বর্তমান ভারত' রচনা করেন**

(a) বিবেকানন্দ (b) বিদ্যাসাগর

(c) রামমোহন (d) রবীন্দ্রনাথ

**উঃ (a) বিবেকানন্দ**

**(ix) শুদ্ধি আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন**

(a) দয়ানন্দ সরস্বতী (b) লালা হংসরাজ

(c) কেশবচন্দ্র সেন (d) বাল গঙ্গাধর তিলক

**উঃ (a) দয়ানন্দ সরস্বতী**

**(x) রামমোহন রায়কে কে 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন ?**

(a) লর্ড মিন্টো (b) সম্রাট বাহাদুর শাহ

(c) মুঘল সম্রাট 'দ্বিতীয় আকবর' (d) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**উঃ (c) মুঘল সম্রাট 'দ্বিতীয় আকবর'**

**(xi) 'Poverty and un-British rule in India' রচনা করেন**

(a) অরবিন্দ (b) গান্ধীজি

(c) দাদাভাই নৌরজী (d) সুরেন্দ্রনাথ

**উঃ (c) দাদাভাই নৌরজী**

**(xii) মুসলিম লীগের কোন অধিবেশনে পাকিস্তান দাবি করা হয় ?**

(a) লাহোর (b) লক্ষ্ণৌ

(c) মাদ্রাজ (d) পাঞ্জাব

**উঃ (a) লাহোর**

**(xiii) 1943-এর বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় ভারতে ভাইসরয় কে ছিলেন?**

(a) ওয়াভেল (b) রিপন

(c) আরউইন (d) ক্লাইভ।

**উঃ (a) ওয়াভেল**

**(xiv) স্তম্ভ-1 এর সাথে স্তম্ভ-2 মেলাও :**

| স্তম্ভ-1 | স্তম্ভ-2 |
|---|---|
| (i) RIN বিদ্রোহ | (A) 1943 |
| (ii) ক্রিপস্ মিশন | (B) 1946 |
| (iii) লিনলিথগো প্রস্তাব | (C) 1942 |
| (iv) আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা | (D) 1940 |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-B, (ii)-D, (iii)-C, (iv)-A (b) (i)-D, (ii)-c, (ii)-A, (iv)-B

(c) (i)-B, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-A (d) এগুলির কোনোটিই নয়

**উঃ (c) (i)-B, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-A**

**(xv) স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার জন্ম হয়**

(a) 1949 খ্রিঃ (c) 1947 খ্রিঃ

(b) 1948 খ্রিঃ (d) 1849 খ্রিঃ

**উঃ (a) 1949 খ্রিঃ**

**(xvi) ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন**

(a) মাউন্টব্যাটেন (b) এটলী

(c) ক্যানিং (d) ওয়ারেন হেস্টিংস

**উঃ (a) মাউন্টব্যাটেন**

**(xvii) পটস্ডাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল**

(a) 1943 সালে (b) 1944 সালে

(c) 1945 সালে (d) 1946 সালে

**উঃ (c) 1945 সালে**

**(xviii) 1949 খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত বিরোধী যে সামরিক চুক্তি হয়েছিল তা হল**

(a) ন্যাটো (b) ব্রাসেলস্

(c) সিয়েটো (d) ওয়ারশ

**উঃ (c) সিয়েটো**

**(xix) 27 দফা দাবি পেশ করা হয়েছিল কোন সম্মেলনে?**

(a) বান্দুং (b) বেলগ্রেড

(c) তেহেরান (d) নতুন দিল্লী

**উঃ (b) বেলগ্রেড**

**(xx) জিওনিস্টদের সংগঠনের সভাপতি ছিলেন**

(a) নাসের (b) বেন গুরিয়ান

(c) ওয়াইজম্যান (d) আরাফত

**উঃ (c) ওয়াইজম্যান**

**(xxi) পি. সি. মহলানবীশ ভারতে কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করেন?**

(a) প্রথম (b) দ্বিতীয়

(c) তৃতীয় (d) চতুর্থ

**উঃ (b) দ্বিতীয়**

**(xxii) বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ..... সালে।**

(a) 1972 (b) 1971

(c) 1947 (d) 1975

**উঃ (b) 1971**

**(xxiii) পেরেস্ত্রৈকার প্রবর্তক ছিলেন**

(a) ক্রুশ্চেভ (b) লেনিন

(c) স্তালিন (d) গর্বাচেভ

**উঃ (d) গর্বাচেভ**

**(xxiv) ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন**

(a) ভাটনাগর (b) মেঘনাদ সাহা

(c) রাজা রমন্না (d) হোমি ভাবা

**উঃ (d) হোমি ভাবা**

**2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও ( বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) : 1 × 16 = 16**

**(i) মার্কেন্টাইলবাদ কী ?**

**উঃ** অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তাঁর 'দি ওয়েলথ অব নেশন' গ্রন্থে বলেছিলেন ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতকারক কাঁচামাল সংগ্রহ ও বিক্রীর বাজার দখলের জন্য যে নীতি নিয়েছিল তা মার্কেন্টাইলবাদ।

**অথবা**

**1612 খ্রিস্টাব্দে ভারতের কোথায় প্রথম ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয় ?**

**উঃ** গুজরাটের সুরাটে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

**(ii) কোন ইউরোপীয় দেশ চীনের সঙ্গে প্রথম ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ?**

**উঃ** পোর্তুগাল।

**অথবা**

**বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চীনের কোন বন্দর দুটি সীমাবদ্ধ ছিল ?**

**উঃ** ম্যাকাও ও ক্যান্টন

**(iii) আলিনগরের সন্ধি কত সালে, কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ?**

**উঃ** ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি, সিরাজ-উদ-দৌল্লা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

**(iv) কোন ভূমিব্যবস্থা জমিদারদের জমির উপর মালিকানা স্বত্ব দিয়েছিল ?**

**উঃ** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

**অথবা**

**কে, কবে পাঞ্জাবকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন ?**

**উঃ** লর্ড ডালহৌসি

**(v) চীনে কোন বছর আফিং আমদানি বন্ধ হয় ?**

**উঃ** ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।

**অথবা**

**উন্মুক্ত দ্বার নীতি কি এবং কে এর প্রবক্তা ?**

**উঃ** মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন হে চিনে বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বাণিজ্যের সমান সুযোগ দেওয়ার নীতি উন্মুক্ত দ্বার নীতি নামে পরিচিত।

**(vi) সাহুকার কাদের বলা হয়?**

**উঃ** বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দরিদ্র কৃষকরা খাজনার অর্থ উঁচু সুদে যে মহাজনদের কাছ থেকে ধার করত, তাদের সাহুকার বলে।

**(vii) কোন গভর্নর জেনারেল অ্যাংলিসিস্ট- ওরিয়েন্টালিস্ট বিতর্কের অবসান ঘটান?**

**উঃ** লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক

**অথবা**

**কবে এবং কেন স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়?**

**উঃ** ১৯১৭ সালে ভারতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে স্যাডলার কমিশন গঠিত হয়

**(viii) কেরালায় কে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন?**

**উঃ** শ্রী নারায়ণ গুরু

**অথবা**

**চীনে কোন বছর মে ফোর্থ আন্দোলন শুরু হয়েছিল?**

**উঃ** ১৯১৯ সালে চিনে

**(ix) মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন কবে পাশ হয়?**

**উঃ** ১৯০৯ খ্রস্টাব্দে।

**(x) কবে এবং কাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?**

**উঃ** ১৯১৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ।

**অথবা**

**কবে ও কোথায় ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়?**

**উঃ** ১৯২৫ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর কানপুরে

**(xi) ক্যাবিনেট মিশনের তিনজন সদস্যের নাম লেখো।**

**উঃ** লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার

**অথবা**

**রশিদ আলি দিবস কবে এবং কেন পালিত হয়েছিল?**

**উঃ** ১৯৪৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ বাহিনীর ক্যাপ্টেন রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠন ধর্মঘটের ডাক দেয়।

**(xii) হো-চি-মিন কে ছিলেন?**

**উঃ** ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা

**অথবা**

**কোন বছর ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয়?**

**উঃ** ১৯৪৯ সালে

**(xiii)"এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য" এই স্লোগান কোন দেশের?**

**উঃ** জাপানের

**(xiv) মার্শাল পরিকল্পনা কী?**

**উঃ** ১৯৪৭ সালে ৫ই জুন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আর্থিক পুণরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে মার্শাল যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন তাকে মার্শাল পরিকল্পনা বলে।

**অথবা**

**ওয়ারশ চুক্তি কবে এবং কেন স্বাক্ষরিত হয়?**

**উঃ** ১৯৫৫ সালের মে মাসে, কমিউনিস্ট দেশগুলির সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং রুশ কর্তৃক বজায় রাখার জন্য ওয়ারশ চুক্তি করে।

**(xv) দাঁতাত কি?**

**উঃ** সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিনীদের ১৯৬০ এর দশকে শেষের দিকে পারস্পরিক নমনীয় ভাব কে দাঁতাত বলা হয়।

**(xvi) বেন বেল্লা কে?**

**উঃ** আলজেরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি

**অথবা**

**পাকিস্তান পিপল্ পার্টি কে গঠন করেন?**

**উঃ** জুলফিকার আলি ভুট্টো।

---

# HISTORY

## 2017

## বিভাগ - ক

**১। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি বিভাগ থেকে ন্যূনতম দুটি প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক): (8x5=40)**

**(i) পেশাদারি ইতিহাস বলতে কী বোঝায়? অপেশাদারি ইতিহাসের সঙ্গে পেশাদারি ইসিহাসের পার্থক্য কী? [3+5]**

উঃ **পেশাদারি শাখা হিসাবে ইতিহাসের গুরুত্ব ঃ** ইতিহাস হল মানবজাতির অতীত কর্মকান্ডের কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক লিখিত বিবরণ। শিক্ষামূলক শাখায় সমাজবিজ্ঞানের প্রাচীনতম শাখাগুলির মধ্যে ইতিহাস হল অন্যতম শাখা। বর্তমান শতাব্দীতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতি ঘটলেও ইতিহাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মোটেই হ্রাস পায়নি। সমাজবিজ্ঞানের শাখা হিসাবে তাই ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বগুলি হল -

(১) **অতীতের আয়না ঃ** ইতিহাস হল অতীতের আয়না। অতীতে ঘটে যাওয়া কাহিনিগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখে ইতিহাস। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব, মানুষের অসভ্য জীবন থেকে ক্রমে সভ্যতার পদার্পণ সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতি, বিভিন্ন জাতির উত্থানপতন, বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজা বাদশার কর্মকান্ড প্রভৃতি সব ঘটনাই ইতিহাসে সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষিত ইতিহাসের কল্যাণকর দিকগুলি অনুসরণ করে বর্তমান প্রজন্ম সুপথে পরিচালিত হতে পারে।

(২) **জ্ঞানের বিকাশ ঃ** সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের ভান্ডারের সবচেয়ে বড়ো শাখা হল ইতিহাস। জ্ঞানের ভান্ডারের প্রায় সবদিক নিয়েই ইতিহাস আলোচনা করে থাকে। মানবসমাজের বিবর্তন, সভ্যতার উত্থানপতন, সাম্রাজ্য ও রাজবংশের উত্থানপতন, ধর্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সংস্কারকার্য বিপ্লব আন্দোলন, মহাপুরুষদের কর্মকান্ড প্রভৃতি সবকিছুই ইতিহাসের আলোচনায় স্থান লাভ করে।

(৩) **বর্তমান যুগের ভিত্তি ঃ** বর্তমানকে ভালো করে জানতে ও বুঝতে গেলে অতীত ইতিহাসকে ভালো করে জানা ও বোঝা দরকার। একমাত্র ইতিহাসই বর্তমানকে ভালো করে জানার সেই সুযোগ করে দেয়।

(৪) **ধারাবাহিকতা ঃ** ইতিহাস বিভিন্ন যুগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও ঘটনাকে ধারাবাহিক করে তোলে। বর্তমান প্রজন্ম এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে ইতিহাস থেকে।

(৫) **স্থিতিশীলতার উপর গুরুত্ব ঃ** ইতিহাস থেকে আমরা সেইসব কারণ উপলব্ধি করে এবং অতীতের ত্রুটিগুলি দূর করে বর্তমান দেশ ও জাতিকে স্থিতিশীল ও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

(৬) **রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন ঃ** ইতিহাস থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শাসকের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। কোনো শাসকের কোনো রাজনৈতিক বা কোনো প্রশাসনিক পদক্ষেপ ভুল ছিল কিনা বা কোনো শাসক কোনো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের উন্নতি ঘটাতে পেরেছিলেন কিনা তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিহাস থেকে পাই।

(৭) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** মানবসমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল অর্থনৈতিক। কী ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে বা কোন আর্থিক ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্র বা সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় তার সুস্পষ্ট চিত্র ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়। বর্তমানকালে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশে গ্রহণ করা উচিত, সেই শিক্ষাও ইতিহাস আমাদের দিতে পারে, যার ভিত্তিতে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ঘটানো সম্ভব।

(৮) **সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঃ** অতীতের সংস্কৃতির ওপরেই কোনো দেশ বা জাতির বর্তমান সংস্কৃতি ছড়িয়ে আছে আর ইতিহাস জানতে সাহায্য করে।

**পেশাদারি ইতিহাস ও অপেশাদারি ইতিহাসের পার্থক্য ঃ**

(১) **উদ্ভব ঃ** প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস চর্চার কাজ পেশাদারি ভিত্তিতে শুরু হয়। সেইসময় থেকে বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের গবেষণাকে পেশাদারি কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবেই ইতিহাসের নানান নতুন দিক উন্মোচন হয়েছে।

অপেশাদারি ইতিহাস চর্চা উনিশ শতকের অনেক আগে থেকে অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়েছে যেমন হিরোডিটাস, থুকিডিডিস ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটান। এরা মূলত পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য কলম ধরেছিলেন।

(২) **আর্থিক সম্পর্ক ঃ** পেশাদারি ইতিহাসচর্চায় আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টি ছড়িয়ে থাকে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প থেকে আর্থিক সহায়তা মেলে। পেশাদারি ইতিহাসবিদ্‌দের জীবন-জীবিকাও বহু অংশে নির্ভরশীল।

অপেশাদারি ইতিহাসচর্চায় আর্থিক সম্পর্ক খুবই কম। সরকারি সহায়তা মেলে না। ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধালাভের সম্ভাবনা বা জীবন-জীবিকা করা তেমনভাবে হয় না।

(৩) **পদ্ধতি ঃ** পেশাদারি ইতিহাসবিদ্ গবেষণার কাজে খুবই উন্নত মানের (যেমন– Carbon-XIV dating) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

অপেশাদারি ইতিহাস চর্চায় সাধারণত ক্ষেত্রসমীক্ষা বা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার প্রাধান্য পায়।

(৪) **সময় ঃ** পেশাদারি ইতিহাসচর্চা হল এক সর্বক্ষণের কাজ। ইতিহাসবিদ্‌গণ তাদের প্রধান পেশা হিসাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন হয়।

অপেশাদারি ইতিহাসচর্চা মূলত আংশিক সময়ের কাজ। পুনর্কথনের মত ইতিহাস বর্ণিত হয়।

(৫) **ব্যাপ্তি ঃ** বর্তমানকালে অধিকাংশ বড় ধরণের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস চর্চা পেশাদারি ইতিহাসবিদ্‌গণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে এই জাতি বা রাষ্ট্রের এমনকি সভ্যতার উত্থান-পতন, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতিসহ বিভিন্ন দিক্‌গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়।

বর্তমানে অপেশাদারি ইতিহাসচর্চা ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে সমস্ত স্থানীয় ইতিহাসচর্চাগুলি হয়ে থাকে সেগুলি স্থানীয় ইতিহাস তুলে ধরে।

**(ii) উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে হবসন-লেলিনের তত্ত্ব আলোচনা কর। (4)**

**উঃ** উত্তর - ২০১৫ (প্রঃ ii)

**(iii) ক্যান্টন বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? এই বাণিজ্যের অবসান কেন হয়? (5+3)**

**উঃ** উত্তর - ২০১৫ (প্রঃ iii)

**অথবা**

**আলিগড় আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (4)**

**উঃ** **সূচনা ঃ-** ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল তা আছড়ে পড়েছিল মুসলিম সমাজের উপরেও। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল 'কলকাতা মহামেডান লিটেলারি সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, পাশ্চাত্যের আলোকে মুসলমান সমাজকে আলোকিত করার প্রথম দায়িত্বভার নেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান। তাঁর নেতৃত্বে আলিগড়কে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বলে তা আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্রিটিশদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের চেষ্টা করেন এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে বেশ কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন।

(১) **সমাজসংস্কার ঃ-** কুসংস্কারে নিমজ্জিত মুসলিম সমাজে আশার আলো জাগাতে সৈয়দ আহমেদ সমস্ত গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তাই তিনি মুসলিম সমাজের উন্নতির উদ্দেশ্যে -

(ক) চিরাচরিত রীতিনীতি, অন্ধবিশ্বাস, মোল্লাতন্ত্রের সকল নির্দেশ অমান্য করে পবিত্র কোরাণের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।

(খ) সমাজে বহুবিবাহ, তালাক প্রথা, পর্দাপ্রথার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন।

(গ) নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষার পক্ষে মত প্রচার করেন।

**সৈয়দ আহম্মদ খান ঃ-** চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বদলে চিন্তার মুক্তি ও যুক্তিবাদী মানের বিকাশ ঘটুক। তিনি লিখলেন - ''চিন্তার স্বাধীনতা যেখানে নেই, সভ্যতাও সেখানে থাকতে পারে না।'' তিনি তাঁর এই মতাদর্শ উর্দুতে 'তহজিব-উল-আকলার্ক' এবং ইংরেজিতে 'পাইওনিয়ার' নামক পত্রিকার মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন।

(২) **শিক্ষা সংস্কার ঃ-** সৈয়দ আহম্মদ খান প্রথম জীবন বাদে সারাটা জীবন ধরেই মুসলিম সমাজের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়েগেছেন। তিনি ইসলামিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখেই মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকতার বিকাশ ঘটাতে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একমাত্র মহৌষধি মনে করতেন। তাই তিনি -

(ক) ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে গাজিপুরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

(খ) ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ে গড়ে তোলেন 'Scientific Society'।

(গ) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন 'Translation Society'।

(ঘ) ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলিগড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Aligarh Anglo Oriental Mohammedan College যা ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

(ঙ) শিক্ষাবিস্তারের কর্মসূচিকে আরও অগ্রবর্তী করার জন্য সৈয়দ আহম্মদ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেন Mohammedan Anglo Oriental Educational Conference।

পরবর্তীকালে ১৮৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আলিগড় কেন্দ্রিক শিক্ষাসংস্কৃতি, সংস্কার কাজ এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের এক পৃথক পরিমন্ডল গড়ে ওঠে সৈয়দ আহম্মদের উদ্যোগে। তাই এটি আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিশিষ্ট নেতাদের উল্লেখযোগ্য ছিলেন - চিরাগ আলি, আলতাফ হোসেন আলি, নাজির আহম্মদ, কবি হালি এবং শিক্ষাবিদ্ ক্ষুদা বক্স প্রমুখ।

(৩) **রাজনৈতিক সংস্কার ঃ** শিক্ষা, সমাজ-সংস্কৃতি ছাড়া রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারে সৈয়দ আহম্মদ খান ও আলিগড় আন্দোলন ভিন্নতর ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথমে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন এবং এর জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Committee for Advancement of Learning Among the Mohammedans of India

কিন্তু পরবর্তীকালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অধ্যাপক থিয়েডর বেক এর সংস্পর্শে আসার পর রাজনীতির ক্ষেত্রে তার এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তখন তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করতে শুরু করেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দুটি পৃথক সম্প্রদায়। শুধু তাই নয়, তিনি ভারতে হিন্দু পরিচালিত কংগ্রেসি আন্দোলনকে 'জনগণের আস্থাহীন যুদ্ধ' বলে অবিহিত করেন।

তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে আলিগড় আন্দোলন মুসলমান সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার এক উজ্জ্বল প্রচেষ্টা। এই আন্দোলন মুসলমানদের আত্মনির্ভর করে তুলেছিল। মুসলিম সমাজ থেকে বহুলাংশে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করে মুসলিমদের আধুনিক করে তোলে। আলিগড় কলেজ থেকেই পরবর্তীকালে বহু কৃতি মুসলিম সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ্ ও রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব হয়।

**(iv) ব্রিটিশ শাসনকালে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের বিবরণ দাও। (4)**

**উঃ সূচনা ঃ** ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকালে সর্বাধিক শোষিত ও নির্যাতিত ছিল আদিবাসী ও দলিত শ্রেণি। ঔপনিবেশিক শাসন কালে ব্রিটিশ সরকার, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, মহাজন প্রভৃতি স্তরের অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়াও আদিবাসী দলিত সম্প্রদায়কে সমাজের উচ্চবর্ণের সামাজিক অবিচারের শিকার হতে হয়। নিম্নবর্গের মধ্যে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ই প্রথম ব্রিটিশ সরকার, জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে দলিতদের প্রতিরোধ শুরু হয়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে আদিবাসী ও দলিতদের এই আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

আদিবাসী আন্দোলনের বিবরণ ঃ

**(১) চুয়াড় বিদ্রোহ ঃ** ভারতের প্রথম আদিবাসী বিদ্রোহ ছিল ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত চুয়ার্ড বিদ্রোহ। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত জঙ্গলমহল, বাঁকুড়া, সিংভূম, ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলে ধমভূমের জগন্নাথ ধলের নেতৃত্বে চুয়াড় আদিবাসীরা বিদ্রোহে শামিল হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই অঞ্চল চুয়াড় আদিবাসীরা বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করে, যার মূল কারণগুলি ছিল - কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচার, বেশ কয়েকবার অনাবৃষ্টি ও শস্যহানি যনিত দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি

**(২) চাক্‌মা বিদ্রোহ ঃ** ১৭৭৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে শের দৌলত, রামু খাঁ প্রমুখের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম চাক্‌মা কৃষক উপজাতি বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোদের মূল কারণ ছিল ওই অঞ্চলে ইজারাদারি শোষণ।

**(৩) কোল বিদ্রোহ ঃ** ১৮৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ছোটোনাগপুর অঞ্চলে হো, মুন্ডা, ওঁরাও, কোল সম্প্রদায়ভুক্ত আদিবাসীগণ, জমিদার মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে

যে আন্দোলনের সূচনা ঘটায় তা কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন বুদ্ধ ভগত, জোয়া ভগত, ছিন্দরাই মানকি প্রমুখ। সীমাহীন দমন নীতির দ্বারা ক্যাপটেন উইলকিনস এই বিদ্রোহ দমন করেন।

(৪) **সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ** ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহ। হাজারীবাগ, মানভূম থেকে শুরু করে রাজমহল পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বিদ্রোহে শামিল হয়। যার কারণগুলি ছিল –

(ক) সাঁওতালদের ধর্মান্তকরণের চেষ্টা।

(খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সাঁওতালদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার দাবি ও জমিদারি উৎপীড়ন।

(গ) সাঁওতাল পরগণায় বহিরাগত (দিকু) দের অত্যাচার।

বীর সিং মাঝি, গোক্কর প্রমুখ অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করলে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর ডালহৌসী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কয়েক হাজার সাঁওতালদের হত্যা করে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

(৫) **মুন্ডা বিদ্রোহ ঃ** ছোটোনাগপুর অঞ্চলে বীরসা মুন্ডা স্বাধীন মুন্ডা রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে যে বিদ্রোহের সূচনা করে তা 'মুন্ডা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। যার কারণগুলি ছিল —

(ক) মুন্ডাদের উপর খাজনার হার বৃদ্ধি।

(খ) খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব বৃদ্ধি।

(গ) মুন্ডাদের যৌথ মালিকানা প্রথার (খুঁৎকাঠি ব্যবস্থা) অবসান।

(ঘ) বেগার শ্রম বৃদ্ধি প্রভৃতি।

মুন্ডা বিদ্রোহ ব্রিটিশদের অস্বস্তির কারণ হলে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বীরসা মুন্ডাকে গ্রেপ্তার করলে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৬) **চঞ্চু বিদ্রোহ ঃ** দক্ষিণ অন্ধ্রে কুপনা, নেলোর অঞ্চলে নাল্লামালাই পার্বত্য উপজাতিদের আদিম খাদ্য সংগ্রহের অধিকার খর্ব করা হলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অরণ্য কমিটি গড়ে, এরা অসহযোগ আন্দোলনের সময় এখানে 'অরণ্য সত্যাগ্রহ' শুরু করে।

(৭) **রাম্পা বিদ্রোহ ঃ** গোদাবরী পার্বত্য অঞ্চলের রাম্পা অঞ্চলে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আলুরি সীতারাম রাজুর নেতৃত্বে মহাজন ও সরকার অরণ্য বিরুদ্ধে রাম্পা জনজাতি যে বিদ্রোহের সূচনা করে তা রাম্পা বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

**দলিতদের আন্দোলনের বিবরণ ঃ** ভারতে হিন্দু সমাজ কাঠামোয় জাতভিত্তিক বিভাজন মানুষে মানুষে কালক্রমে এমন বিভেদ সৃষ্টি করেছিল যে সমাজের কিছু জাতি অধঃপতিত,

অচ্ছুত হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এরাই দলিত পরিগণিত। কোম্পানি আমলে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য এই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল –

(১) **এজহাবা সম্প্রদায়ের আন্দোলন ঃ** দক্ষিণ ভারতের কেরালায় এজহাবা সম্প্রদায় ছিল দলিত। তারা শ্রী নারায়ণ গুরুর নেতৃত্বে সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। তারা হিন্দু হলেও তাদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না, মন্দিরের চলার পথ দিয়ে চলার অধিকার ছিল না। তারা প্রথম ভাইকম সত্যাগ্রহের মাধ্যমে পথ চলার অধিকার লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অণুকরণ করে নিজেদের সামাজিক অবস্থানে উন্নতির চেষ্টা করে।

(২) **নাদার সম্প্রদায়ের আন্দোলন ঃ** দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর দক্ষিণ নাদার সম্প্রদায় অনুরূপ আন্দোলন করে। এই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ব্যবসা বা অন্য কাজ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের হীন সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করার চেষ্টা করে। এরপর মন্দিরে প্রবেশের (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে) দাবিকে কেন্দ্র করে উঁচু জাতের সঙ্গে দলিতদের দাঙ্গা বাঁধে।

(৩) **দলিত পল্লি সম্প্রদায়ের আন্দোলন ঃ** তামিলনাড়ু উত্তরে দলিত পল্লি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। খেতমজুর, পশুচারণ ও বিভিন্ন কাজ করে তার জীবিকা নির্বাহ করত। এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সচ্ছলতা লাভ করে নিজেদের বানিয়া ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। তারা ব্রাহ্মণদের অনুকরণ করে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করে।

(৪) **মাহার সম্প্রদায়ের আন্দোলন ঃ** মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায় ছিল দলিত গোষ্ঠী। ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর এই সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাবা ভালংকার নামে একজন প্রাক্তন সেনাকর্মীর নেতৃত্বে মাহাররা জোটবদ্ধ হয়। ভালংকার তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সেনাবাহিনী ও সরকারি কাজে নিয়োগের দাবি জানায়।

১৯৪২ সালে আম্বেদকর সর্বভারতীয় তপশিলি জাতি ফেডারেশন গঠন করলে রাজনৈতিক গুরুত্ব দলিতদের বেড়ে যায়।

## বিভাগ - খ

**(v) মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের (১৯১৯) বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো। এই আইনের ত্রুটিগুলি আলোচনা করো। (4+4)**

**উঃ** উত্তর - ২০১৫ (প্রঃ v)

**(vi) ভারতছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো এবং এই আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। (4)**

**উঃ** ভারতছাড়ো আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে গণ-বিপ্লব। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু এই আন্দোলনকে 'স্বতঃস্ফূর্ত গণ অভ্যুত্থান' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ''নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ-আয়োজন নেই, কোনো মন্ত্রবল নেই, অথচ একটা অসহায় জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মপ্রচেষ্টার আর কোনো পন্থা না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল - এ দৃশ্য প্রকৃতই বিস্ময়ের ব্যাপার।'' ভারতের ইতিহাস এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম -

(১) **গণ আন্দোলন ঃ** এই আন্দোলন ছিল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, ধনী-নির্ধন প্রমুখ দেশের সকল শ্রেণির মানুষের ব্যাপক সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। গর্ভনর জেনারেল লর্ড লিনলিথগো পর্যন্ত স্বীকার করেছেন - ''এমন ব্যাপক সরকার বিরোধী আন্দোলন সিপাহী বিদ্রোহের পর আর দেখা যায়নি।''

(২) **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসার ঃ** এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। মুসলিম লিগ আন্দোলনে যোগ না দিলেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল আন্দোলনের মূল স্তম্ভ।

(৩) **কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি ঃ** এই অন্দোলন দেশবাসীর অন্তরে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অনেকটাই বৃদ্ধি করে। কংগ্রেসের ডাকে এই আন্দোলনে ভারতের সর্বস্তরের জনগণ শামিল হয়। ফলে জনমানসে কংগ্রেসের প্রভাব ব্যাপক ও সর্বাত্মক হয়।

(৪) **স্বাধীনতা প্রস্তুতি ঃ** ভারত ছাড়ো আন্দোলন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারত স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং তা অর্জনের জন্য তারা সব ধরণের ত্যাগ, তিতিক্ষা, অত্যাচারের, লাঞ্ছনা এমনকি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত ছিল। অরুণ চন্দ্র ভুঁইয়া তার 'The Quit India Movement' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, এই আন্দোলনের ফলে যে জাতীয় জাগরণ ও ঐক্যবোধের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তা ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

(৫) **ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তুতি ঃ** এই আন্দোলন প্রমাণ করে যে মুক্তি সংগ্রামে ভারতের জয় অনিবার্য। কখন ও কী অবস্থায় ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে কী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে - এরপর কেবল ওইটুকুই অমীমাংসিত থাকে। লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ সরকারকে এক গোপন রিপোর্টে জানান যে, ''ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এই ধরনের কোন আন্দোলন পুনরায় ঘটলে তার মোকাবিলা করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব। তাই আয়ারল্যান্ড ও মিশরে ব্রিটিশ সরকার যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেছে, ভারতে তা এখনই করা দরকার।''

১৯৪২ সালে গান্ধীজি 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগানের মধ্য দিয়ে ৯ই আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। সরোজিনী নাইডু গান্ধীজীর সাথে ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার হন ও প্রায় ২১ মাস কারাবাস করেন। স্কুল কলেজের ছাত্রীরা এই আন্দোলনে সামিল হয়। অরুণা আসফ আলি, সুচেতা কৃপালিনী নেত্রীবৃন্দ গোপনে মেয়েদের সংগঠিত করেন। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা ভগিনী সেনা দল গঠন করেন। আন্দোলন চলাকালীন গান্ধীবুড়ি নামে পরিচিত এই নারী তমলুকের সরকারি অফিসে (থানা) জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ঘেরাও করতে গেলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তারারানী শ্রীবাস্তব ছিলেন এক স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেবার জন্য সুপরিচিত। বিহারের সিওয়ানে জেলায় তিনি এবং তার স্বামী পুলিশ স্টেশনের দিকে মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলে, স্বামী গুলিবিদ্ধ হন- তখন এই মহীয়সী নারী নিজেই নেতৃত্ব দেন। উষা মেহেতা আন্ডারগ্রাউন্ড রেডিও স্টেশন চালু করেন। সুচেতা কৃপালিনী ও অরুণা আসফ আলি আঞ্চলিক স্তরে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। আসামের ১৩ বছরের কনকলতা বড়ুয়া, পঞ্জাবের গৃহবধূ ভোগেশ্বরী ফুকোননী প্রমুখ এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

**(vii) ট্রুম্যান নীতি কী? মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল? (4+4)**

**উঃ ট্রুম্যান নীতি ঃ** মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি টুম্যান ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ মার্চ মার্কিন কংগ্রেসে এক বক্তৃতা দেন, যে বক্তৃতায় তিনি বলেন - ''মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হল মুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং বিশ্বের যে-কোনো স্থানে কোনো মুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সশস্ত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা কোনো বিদেশি রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে আক্রান্ত রাষ্ট্রকে আমেরিকা সব ধরণের সহায়তা দান করবে।'' রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের এই ঘোষণা টুম্যান নীতি নামে পরিচিত।

**ট্রুম্যান নীতির লক্ষ্য ঃ** আমেরিকা ট্রুম্যান নীতির মূলত দুটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল -

(১) ইউরোপের ভূখন্ডের বাইরে বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

(২) সোভিয়েত শক্তিবলয়ের পালটা বিকল্প হিসাবে পশ্চিমি পুঁজিবাদী জোট গঠনের কাজে অগ্রসর হওয়া।

এই নীতি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিস ও তুরস্ককে ৪০ কোটি ডলার প্রাথমিক সাহায্য পাঠায়। শুধু তাই নয় পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সর্বত্র এই নীতি প্রয়োগ করে।

**মার্শাল পরিকল্পনা ঃ** ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৫ জুন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জর্জ. সি. মার্শাল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, ''যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য, ক্ষুধা হতাশা, বেকারত্ব ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে আমেরিকা অর্থ সাহায্য করবে। এমনকি কমিউনিস্ট শাসিত রাষ্ট্রগুলিও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক

সাহায্য লাভ করতে পারবে।" মার্শালের নামানুসারে এই কর্মসূচি সাধারণভাবে মার্শাল পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনায় বলা হয় -

(১) সাহায্যগ্রহণকারী দেশগুলি একটি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার নাম Organization of European Exonomic Co-operation (OEEC)

(২) এই সংগঠনভুক্ত দেশগুলি তাদের নিজস্ব সম্পত্তি ও মার্কিন সাহায্য পরস্পরের প্রয়োজনে ব্যয় করবে।

(৩) সদস্যদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মার্কিন সাহায্য দেওয়া হবে।

(৪) এই নীতি বা কর্মসূচি কোনো দেশ বা মতাদর্শের বিরুদ্ধে নয়।

**মার্শাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঃ** মার্শাল পরিকল্পনা প্রয়োগের পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলি ছিল -

(১) সাম্যবাদের প্রভাব থেকে পশ্চিম ইউরোপকে রক্ষা করা।

(২) ইউরোপের দেশগুলিতে মার্কিন প্রাধান্য স্থাপন সুনিশ্চিত করা।

(৩) অর্থ সাহায্যকারী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করে মার্কিন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

(৪) অর্থ সাহায্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রজোটের শক্তিবৃদ্ধি ঘটানো।

**অথবা,**

**কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।** **(8)**

**উঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠান্ডা যুদ্ধের সময় আর একটি সংকট বিশ্বকে আণবিক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, তা ছিল কিউবা সংকট। কিউবা হল ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ। দেশটি চিনি উৎপাদনের জন্য জগৎবিখ্যাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত লাইন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল এই দেশটির উপর। নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে কিউবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্যালজেনিকো বাতিস্তা ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কিউবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

**ফিদেল কাস্ত্রোর ক্ষমতালাভ ঃ** বাতিস্তা সরকারের আমলে দেশে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, অসাম্য, স্বৈরাচার প্রভৃতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। ফলে মার্কিন মদতপুষ্ট এই সরকারের প্রতি কিউবার জনগণের সমর্থন ছিল না। বাতিস্তা সরকারের অপদার্থতার সুযোগে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি ফিদেল কাস্ত্রো কিউবায় এক অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করেন।

কিউবাতে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলে আমেরিকার সাথে কিউবার বিরোধের সূচনা হয়। যেমন -

(১) কাস্ত্রো কিউবায় আমেরিকার সমস্ত সম্পত্তি এমনকি চিনি কলের জাতীয়করণ করেন।
(২) রাশিয়া, চিন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন।

**মার্কিন প্রতিক্রিয়া ঃ** কিউবার কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সঙ্গে সমস্ত রকম কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ক্ষুব্ধ আমেরিকা কিউবাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়। মার্কিন উদ্যোগে কাস্ত্রো সরকারকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ১৪০০ জন কাস্ত্রো বিরোধীকে কিউবার পিগ উপসাগরে অবতরণ করায়। বিদ্রোহীদের সহায়তার জন্য প্রস্তুত ছিল মার্কিন বি-২৬ বিমান। কিন্তু মাত্র দু-দিনের মধ্যে কাস্ত্রো এই বিদ্রোহ দমন করে। তথাপি মার্কিন প্রশাসন কাস্ত্রোকে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বদ্ধ পরিকর হয় এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি ঘোষণা করেন - আমরা কিউবাকে কমিউনিস্টদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। এই পরিস্থিতিতে কিউবা রাশিয়ার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হন।

**কিউবায় রাশিয়ার ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণ ঃ** এই ঘটনার এক বছরের মধ্যেই রাশিয়া কিউবাকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণা করে, কিউবাতে রাশিয়া সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এমনকি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন যে - ''কিউবার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য রাশিয়া তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। এই কারণেই রাশিয়া কিউবায় ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণ করে। এক্ষেত্রে রাশিয়ার উদ্দেশ্য দুটি ছিল -

(১) কিউবাতে ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি নির্মান করে আমেরিকাকে চাপে রাখা।

(২) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়া কিউবাতে ৪৮টি মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মিগ-২১ ও ২৪টি আনবিক বোমার বিমান সরবরাহ করা।

* আকাশ ও নৌপথে যখন রাষ্ট্রপতি কেনেডি কিউবা অবরোধ ঘোষণা করেন। রুশ ও মার্কিন দুপক্ষই সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি অপসারণ করলে, মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করে।

**গুরুত্ব ঃ** প্রায় টানা দুসপ্তাহ ধরে কিউবাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্ব জুড়ে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। তবুও বিশ্ব রাজনীতিতে কিউবা সংকটের গুরুত্ব ছিল সুদুরপ্রসারী, যেমন -

(১) কিউবা সংকট প্রমাণ করেছিল বিশ্বের যে-কোনো সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে দাঁতাত রাজনীতির উদ্ভব ঘটে।

(২) দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে কিউবার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

(৩) কিউবাকে কেন্দ্র করে পরমাণু যুদ্ধের সৃষ্টি হলেও উভয়পক্ষ যেভাবে শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করে তার ফলে মানবতার জয় সুনিশ্চিত হয়।

**(viii) স্বাধীন ভারতের প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও গুরুত্ব আলোচনা করো। (8)**

৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা লাভের পর ভারত-প্রথম থেকেই নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। গান্ধীজি যথার্থ বলেছিলেন যে ''স্বাধীনতা লাভের পর যে এই দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে সে এক কাঁটার মুকুট পারবে।'' দেশভাগ, উদবাস্তু সমস্যা, দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্যায় জীর্ণ সদ্য-স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুণ ছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামিল করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু সক্রিয় উদ্যোগ নেন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন' বা 'যোজনা কমিশন' (Indian Planning Commission) গঠিত হয়। এই পরিকল্পনা কমিশন গঠনের তিনটি মূল উদ্দেশ্য -

(১) প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত উপায় উন্মুক্ত থাকবে।

(২) দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে করা হবে যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

(৩) কর্মসূচি ও সম্পদ বন্টনের বিষয়টি এমন কোনোভাবেই করা হবে না যাতে সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হয়।

**প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬ খ্রিস্টাব্দে) ঃ** স্বাধীনতা লাভের পর ভারত যে বহুমুখী অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যার উদ্দেশ্যগুলি ছিল -

(১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট ভারতে অর্থনৈতিক সংকট দূর করা।

(২) উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা এবং ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো।

এই পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ, শক্তি উৎপাদন, গোষ্ঠী উন্নয়ন, পরিবহন, পুনর্বাসন প্রবৃত্তি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ব্যয় ধরা হয় ২৩৭৮ কোটি টাকা।

**অগ্রগতি ঃ** প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি মোটামুটি সফল হয়েছিল। এই পরিকল্পনার ফলে ভারতের জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ, মাথাপিছু আয় ১০.৮ শতাংশ কৃষি উৎপাদন ২২ শতাংশ, শিল্প উৎপাদন ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

(১) এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে চলা স্থিতাবস্থার অবসান ঘটে।

(২) এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে পরিকল্পিত অর্থনৈতির পথ-চলা শুরু হয়।

(৩) ভারতবাসীর মধ্যে দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়।

**দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১ খ্রিস্টাব্দ) ঃ** প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোটামুটি সাফল্যলাভের পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণসাধন এবং বেসরকারি উদ্যোগ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেবার কথা ঘোষণা করেন। নেহরুর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট এর প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি রূপরেখা বা মডেল তৈরি করেন। নেহেরু কিছু সংশোধনের পর এই মডেলটির প্রয়োগ ঘটান। যে কারণে এটি নেহরুর-মহলানবিশ মডেল নামে পরিচিত।

**লক্ষ্য ঃ** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি ছিল -

(১) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা।

(২) ভারী ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া।

(৩) অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৪) পরিকল্পনা খাতে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়।

**অগ্রগতি বা সাফল্য ঃ** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্য আশানুরূপ হয়নি। তবুও এই পরিকল্পনার দ্বারা -

(১) জাতীয় আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(২) বিদ্যুৎ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

(৩) দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেল্লায় ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়।

(৪) ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রপাতি নির্মানশিল্পের সূচনা হয়।

**মূল্যায়ন ঃ** বিভিন্ন ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কয়েকটি কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল -

(১) এই পরিকল্পনায় শক্তির উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(২) ভারী শিল্প ও শিল্প প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যায়।

(৩) অন্তত ৯০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

**তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ** প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে আরও বেশি বাস্তবধর্মী করে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয় এবং এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে ধার্য হয় -

(১) প্রতি বছর ৫ শতাংশ জাতীয় আয় বাড়ানো।

(২) খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

(৩) শিল্প ও রপ্তানির চাহিদামতো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৪) ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প-যন্ত্রপাতি, শক্তি প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৫) কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

(৬) বৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বন্টন করা।

**অগ্রগতি ও সাফল্য ঃ** তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় ধার্য করা হয় ১১৬০০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় -

(১) গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে, গ্রাম-পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, সমবায় সমিতি ;প্রভৃতির সম্প্রসারণ ঘটানো হয়।

(২) ক্ষুদ্র ও ভারী বুনিয়াদি শিল্পের বিকাশে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

(৩) শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব বাড়ানো হয়।

**উপসংহার ঃ** প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির মধ্যে দিয়ে ভারতে মিশ্র অর্থনীতির সূচনা হয়। যদিও সমস্ত পরিকল্পনাই তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারেনি, তা সত্ত্বেও এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কেননা পরিকল্পনাগুলির দরুণ ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়।

## বিভাগ - খ

**1. বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : 1 × 24 = 24**

**(i) ''মিথ' শব্দটি এসেছে 'মিথোস' থেকে যেটি একটি –**

(a) গ্রিক শব্দ (b) রোমান শব্দ

(c) লাতিন শব্দ (d) জার্মান শব্দ

**উঃ (a) গ্রিক শব্দ**

**(ii) জীবনের জলসাঘরে' কার আত্মজীবনী?**

(a) দক্ষিণারঞ্জন বসু (b) মণিকুন্তলা সেন

(c) নারায়ণ সান্যাল (d) মান্না দে

**উঃ (d) মান্না দে**

**(iii) যে নীতির মাধ্যমে কোনো শক্তিশালী দেশ অন্যান্য দেশে শাসন কায়েম করে তাকে বলে–**

(a) সাম্রাজ্যবাদ (b) মানবতাবাদ

(c) সামরিকবাদ (d) জাতীয়তাবাদ

**উঃ (a) সাম্রাজ্যবাদ**

**(iv) 'নতুন বিশ্ব' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন–**

(a) কলম্বাস (b) আমেরিগো ভেসপুচি

(c) অ্যাডাম স্মিথ (d) স্যার ওয়ালটার র‍্যালে

**উঃ (b) আমেরিগো ভেসপুচি**

**(v) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়**

(a) ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে (b) ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে

(c) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে (d) ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে

**উঃ (c) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে**

**(vi) স্তম্ভ-১ এর সাথে স্তম্ভ-২ মেলাও :**

| স্তম্ভ-১ | স্তম্ভ -২ |
|---|---|
| (i) টিপু সুলতান | (A) অমৃতসরের সন্ধি |
| (ii) রঞ্জিৎ সিং | (B) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি |
| (iii) মীরকাশিম | (C) বক্সারের যুদ্ধ |
| (iv) লর্ড ডালহৌসি | (D) চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-A, (ii)-B, (iii)-D, (iv)-C (b) (i)-B, (ii)-D, (iii)-A, (iv)-C

(c) (i)-A, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-B (d) (i)-B, (ii)-A, (iii)-C, (iv)-D.

**উঃ (d) (i)-B, (ii)-A, (iii)-C, (iv)-D.**

**(vii) স্তম্ভ-১ এর সাথে স্তম্ভ-২ মেলাও :**

| স্তম্ভ-১ | | স্তম্ভ -২ | |
|---|---|---|---|
| (i) | বোগ-এর সন্ধি | (A) | ১৮৪৩ |
| (ii) | তিয়েনসিন-এর সন্ধি | (B) | ১৮৪২ |
| (iii) | পিকিং-এর সন্ধি (কনভেনসন) | (C) | ১৮৬০ |
| (iv) | নানকিং-এর সন্ধি | (D) | ১৮৫৮ |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-A, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-B (b) (i)-B, (ii)-c, (iii)-D, (iv)-A

(c) (i)-A, (ii)-D, (iii)-C, (iv)-B (d) (i)-C, (ii)-D, (iii)-B, (iv)-A

**উঃ (c) (i)-A, (ii)-D, (iii)-C, (iv)-B**

**(viii) দক্ষিণী বিদ্যাসাগর' কাকে বলা হত?**

(a) বীরসালিঙ্গম পানতুলু (b) শ্রী নারায়ণ গুরু

(c) বিশ্বনাথ সত্যারাম (d) উন্নভা লক্ষ্মিনারায়ণ

**উঃ (a) বীরসালিঙ্গম পানতুলু**

**(ix) কুয়োমিনটাং-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?**

(a) চৌ এন-লাই (b) সান ইয়াৎ-সেন

(c) চিয়াং কাই-শেক (d) মাও সে-তু

**উঃ (b) সান ইয়াৎ-সেন**

**(x) 'হিন্দু পাইওনিয়ার' পত্রিকাটি প্রকাশ করে**

(a) নব্যবঙ্গ (b) প্রার্থনা সমাজ

(c) আর্য সমাজ (d) ব্রাহ্ম সমাজ

**উঃ (a) নব্যবঙ্গ**

**(xi) লক্ষ্ণৌ চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?**

(a) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে (b) ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে

(c) ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে (d) ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে

**উঃ (a) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে**

**(xii) ভাইকম-এর 'মন্দির প্রবেশ' আন্দোলনের নেতৃত্ব কে দেন?**

(a) ডঃ আম্বেদকর (b) এ. কে. গোপালন

(c) জ্যোতিবা ফুলে (d) কে. পি. কেশব মেনন

**উঃ (d) কে. পি. কেশব মেনন**

**(xiii) বারদৌলি সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব কে দেন?**

(a) রাজকুমার শুক্লা (b) রাজেন্দ্র প্রসাদ

(c) বল্লভভাই প্যাটেল (d) কল্যাণজি মেহেতা

**উঃ (c) বল্লভভাই প্যাটেল**

**(xiv) ক্রিপস্ মিশন যখন ভারতে এসেছিল তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**

(a) উইনস্টোন চার্চিল (b) লিনলিথগো

(c) ক্লিমেন্ট এটলী (d) স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্

**উঃ (a) উইনস্টোন চার্চিল**

**(xv) গুজরাটের খেরা জেলার দরিদ্র কৃষক কী নামে পরিচিত ছিল?**

(a) হরিজন (b) কুনবি

(c) পত্তিদার (d) বর্গাদার

**উঃ (b) কুনবি**

**(xvi) 'আজাদ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোথায়?**

(a) টোকিওতে (b) ব্যাঙ্কক-এ

(c) রেঙ্গুন-এ (d) সিঙ্গাপুর-এ

**উঃ (d) সিঙ্গাপুর-এ**

**(xvii) উত্তর-আটলান্টিক সামরিক জোট (NATO) কবে গঠিত হয়েছিল?**

(a) ১৯৪৮ খ্রিঃ (b) ১৯৪৯ খ্রিঃ

(c) ১৯৫০ খ্রিঃ (d) ১৯৫১ খ্রিঃ

**উঃ (b) ১৯৪৯ খ্রিঃ**

**(xviii) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন–**

(a) জওহরলাল নেহরু (b) মার্শাল টিটো

(c) ডঃ সুকর্ণ (d) গামেল আবদেল নাসের

**উঃ (a) জওহরলাল নেহরু**

**(xix) প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?**

(a) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে (b) ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে

(c) ২০০০ খ্রিস্টাব্দে (d) ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে

**উঃ (a) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে**

**(xx) দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধে কে জয়ী হয়েছিল?**

(a) ভিয়েতনাম (b) ফ্রান্স

(c) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (d) কাম্বোডিয়া

**উঃ (a) ভিয়েতনাম**

**(xxi) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**

(a) মহম্মদ আলি জিন্নাহ (b) জুলফিকার আলি ভুট্টো

(c) ইয়াহিয়া খান (d) আয়ুব খাঁ

**উঃ (c) ইয়াহিয়া খান**

**(xii) ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল**

(a) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে (b) ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে

(c) ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে (d) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে

**উঃ (a) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে**

**(xiii) SAARC-এর ধারণা কার মস্তিষ্কপ্রসূত?**

(a) রাজা বীরেন্দ্র (c) মোরারজি দেশাই

(b) ইন্দিরা গান্ধি (d) জিয়াউর রহমন

**উঃ (d) জিয়াউর রহমন**

**(xxiv) 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' ধারণাটি কোন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত?**

(a) নেহরু (b) হো চি মি

(c) সুকর্ণ (d) সুহার্তো

**উঃ (c) সুকর্ণ**

**2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও ( বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় ) : 1 x16 = 16**

**(i) স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন ?**

**উঃ** ড. সুকর্ন।

অথবা,

**স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন কবে হয়েছিল ?**

**উঃ** ১৯৫১-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে।

**(ii) বার্লিন অবরোধ বলতে কী বোঝায় ?**

**উঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত বিরোধিতার কারণে রাশিয়া পশ্চিম জার্মানি থেকে বার্লিনকে আলাদা করতে যে অবরোধ নীতি ঘোষণা করে, তাকে বার্লিন অবরোধ বলে।

অথবা,

**বুলগানিন কে ছিলেন ?**

**উঃ** ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

**(iii) লিনলিথগো প্রস্তাব অথবা আগস্ট প্রস্তাব কবে ঘোষিত হয় ?**

**উঃ** ১৯৪০ সালের ৮ই আগস্ট।

অথবা,

**ক্রিপস্ মিশনের প্রস্তাবে গান্ধিজি কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ?**

**উঃ** ফেল পড়া ব্যাঙ্কের উপরে কাটা চেক– A post dated cheque on a crashing bank।

**(iv) মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কতজন শ্রমিক নেতা অভিযুক্ত হন ?**

**উঃ** ৩৩ জন।

**(v) হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন কোনসালে প্রবর্তিত হয় ?**

**উঃ** ১৮৫৬ সালে।

অথবা,

**'চুইয়ে পড়া' নীতি বলতে কী বোঝায় ?**

**উঃ** লর্ড মেকলে পাশ্চাত্যের ইংরেজি শিক্ষা উঁচুতলা থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া বোঝাতে 'চুঁইয়ে পড়া' নীতি বলেছেন।

**(vi) কোন আইন দ্বারা কলকাতার সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয় ?**

**উঃ** ১৭৭৪ সালের রেগুলেটিং আইন অনুযায়ী।

অথবা,

**তাইপিং বিদ্রোহ কবে এবং কোথায় হয়েছিল**

**উঃ** ১৮৫০ - ১৮৬৪ সালে, চিনে।

**(vii) সোস্যাল ডারউইনবাদের প্রবক্তা কে?**

**উঃ** হারবার্ট স্পেনসার।

**(viii) লগ্নি পুঁজি কাকে বলে?**

**উঃ** যে পুঁজি বা অর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য বিনিয়োগ করা হয় তাকে লগ্নি পুঁজি বলে।

**(ix) বর্ণ বৈষম্য নীতি কোন দেশে বলবৎ হয়?**

**উঃ** দক্ষিণ আফ্রিকা।

**(x) ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?**

**উঃ** কিউবার রাষ্ট্রপতি।

**(xi) কার নেতৃত্বে ঝাঁসি রেজিমেন্ট গঠিত হয়?**

**উঃ** নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

**(xii) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি কে, কখন ঘোষণা করেন?**

**উঃ** ১৯৩২ সালে, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড।

অথবা

**মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের গুরুত্ব কী?**

**উঃ** পৃথক পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন।

**(xiii) 'নব্যবঙ্গীয়' কারা?**

**উঃ** ডিরোজিওর যুক্তিবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামতনু লাহিড়ি, প্যারিচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং তৎসহ যুবসম্প্রদায়কে 'নব্যবঙ্গীয়' বলা হত।

অথবা,

**চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কাদের বলা হয়?**

**উঃ** যে শ্রমিকরা নিয়োগকর্তার চুক্তিতে আবদ্ধ।

**(xiv) একশো দিনের সংস্কার কী ছিল?**

**উঃ** ১৮৯৮ সালের ১১ জুন চিনা সম্রাট কোয়াং-সু শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে একশো তিন দিন ব্যাপী যে সংস্কার করেছিলেন, তা একশো দিনের সংস্কার নামে পরিচিত।

**(xv) সর্বশেষ চার্টার আইন কবে প্রবর্তিত হয়?**

**উঃ** ১৮৫৩ সালে।

অথবা,

**'পলাশির লুণ্ঠন' বলতে কী বোঝ?**

**উঃ** পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার অর্থসম্পদ যেভাবে ইংল্যান্ডে পাচার হত তাকে 'পলাশির লুণ্ঠন' বলে।

**(xvi)'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলতে কী বোঝানো হয়?**

**উঃ** শ্বেতাঙ্গ মানুষরা এশিয়া এবং আফ্রিকার অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষের উপর যে অত্যাচার করত তাকে 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলে।

# HISTORY

## 2018

### বিভাগ - ক

**১। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি বিভাগ থেকে ন্যূনতম দুটি প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক): (8x5=40)**

**(i) অতীতকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কিংবদন্তি বা মিথ এবং স্মৃতিকথার ভূমিকা আলোচনা করো।**

**উঃ**

**কিংবদন্তি মিথ ঃ**

মিথ কথাটি এসেছে লাতিন শব্দ 'Legenda' থেকে। একশ্রেনির ঐতিহাসিক মনে করেন যে মানবসমাজে ইতিহাসবোধ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই কিংবদন্তি, কাহিনিগুলি গড়ে উঠতে শুরু করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্যের প্রবক্তাগণ প্রথম কিংবদন্তি শব্দটির ব্যবহার করেন বলে মনে করা হয়। কোনো ঘটনা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য তারা এই শব্দটির ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়।

**আনন্দও শিক্ষাদানের মাধ্যম ঃ**

কিংবদন্তির ঘটনাগুলি সমাজে অনেকক্ষেত্রেই আনন্দদান বা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এই কাহিনিগুলির চরিত্রদের সম্পর্কে তথ্য পাঠ করে পাঠকগন আনন্দ লাভ করেন। এক্ষেত্রে রাজাকৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড়ের কথা বলা যায়। এছাড়া কিংবদন্তি ঘটনাগুলি থেকে মানুষ নীতিবিদ্যা লাভ করে থাকে।

**বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা ঃ**

কিংবদন্তি বা Legend এর বিষয়বস্তু ভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলি একদিকে যেমন কল্পনা নির্ভর, তেমনই অন্যদিকে চরিত্র নির্ভর হয়ে থাকে। সঠিকভাবে বলতে গেলে কিংবদন্তির কাহিনি বা চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রের বৈচিত্র্য বা বিষয় উপস্থাপনার বৈচিত্র্যের জন্য কিংবদন্তি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কোনো ব্যক্তি তার জীবনের অনেকটা সময় অতিক্রম করার পর অতীত জীবনের ফেলে আসার কোনো ঘটনার স্মৃতিচারণের প্রকাশকেই বলা হয় স্মৃতিকথা। (memoirs) প্রত্যেক মানুষ তার ফেলে আসা জীবনের ঘটনার স্মৃতিচারন করতে ভালোবাসে, স্মৃতিকে সামনে নিয়ে এসে তাকে ভাষায় প্রয়োগ করে পাঠকের কাছে তুলে ধরাকে বলা হয় সাহিত্য এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিকে বলা হয় স্মৃতি সাহিত্য।

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি ঃ** স্মৃতিসাহিত্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ঘটনাগুলি নিয়ে হতে পারে। স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে ওপার বাংলা থেকে উদ্‌বাস্তু হয়ে বহু

মানুষ ভারতবর্ষে চলে আসে দীর্ঘদিন পরে সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্যিক তাদের স্মৃতিচারন মূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

**হিরনময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্‌বাস্তু ঃ**একাত্তরের ডায়েরি (বেগম সুফিয়া কামাল) **পথের পাঁচালি** উপন্যাসে অপু এবং দুর্গার ছোটো বেলার অনেক ঘটনাকে স্মৃতিচারন হিসাবে যুবক অপুর মুখ দিয়ে লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন– বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসুর ''যতদূর মনে পড়ে'' গ্রন্থে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ও তৎকালীন সময়ের অনেক উত্থাল পাতালের বর্ণনা দিয়েছেন।

**বৈশিষ্ট্য ঃ**

i) স্মৃতিকথা হয় প্রকৃতপক্ষে অতীত ঘটনার সরাসরি বর্ণনা। অনেক বছর পরেও তা অবিকল একিভাবে লেখক বর্ণনা করে থাকেন।

ii) স্মতিকথা হলো লেখকের নিজস্ব অনুভূতি অর্থাৎ লেখক এখানে নিজেই কথক।

iii) স্মৃতিকথা কোনো কাল্পনিক উপন্যাস নয়, এটি বাস্তব চিত্র।

**উদাহরণ ঃ**

i) বুদ্ধদেব বসু ''**আমার জীবন**'' নামক স্মৃতিকথায় পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামজীবনের ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন।

ii) সাহিত্যিক সমর সেন তাঁর **বাবু বৃতান্ত** গ্রন্থের তাঁর ফেলে আসাজীবনের অনেক কথা বর্ণনা করেছেন।

iii) বিপ্লবী বীনা দাস তাঁর **শৃঙ্খলা ঝঙ্কার** ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাসহ তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

iv) নারায়ন সান্‌নাল তাঁর লেখা আমি নেতাজীকে দেখেছি প্রত্যক্ষ দোষী হিসেবে রাজনৈতিক জীবনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন।

**(ii) ঔপনিবেশিক সমাজে জাতি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও তার প্রভাব আলোচনা করো।**

**উঃ** ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি অন্য জাতিকে হীন বলে মনে করে তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতির মাধ্যমে বারংবার প্রকাশ করত। যেমন—

**(১) জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ঃ** ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি তাদের অধিকৃত উপনিবেশে নিজেদের সীমাহীন জাতিগত গৌরবের কথা প্রচার করে। যেমন, জেমস মিল মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনে অনুন্নত ভারতীয়দের মঙ্গল হচ্ছে।

**(২) অভিভাবকত্বের মানসিকতা ঃ** সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কিছু মানুষ এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলির বাসিন্দাদের সঘোষিত অভিভাবক হিসেবে নিজেদের তুলে ধরেন। তাঁরা উপনিবেশের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংস্কৃতবান করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লর্ড ক্রোমার, লর্ড মিলার, লর্ড লুগার্ড প্রমুখ।

**(৩) জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ঃ** সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলি চার্লস ডারউইনের যোগ্যতম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা'-র তত্ত্ব প্রচার করে। তারা বলে, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের উপকরণে ঘাটতি দেখা দিলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য বা শক্তিশালী জাতি এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকবে।

**(৪) শ্বেতাঙ্গদের উন্নাসিকতা ঃ** সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির চেয়ে শ্বেতাঙ্গ জাতির মানুষ অনেক বেশি উন্নত সভ্যতার অধিকারী। এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ কখনোই তাদের সমকক্ষ হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী নীতির মাধ্যমে তাদের উন্নত সভ্যতার রূপটি প্রকাশিত হয় বলে শ্বেতাঙ্গরা মনে করত।

**(৫) জাতিগত ব্যবধান ঃ** উপনিবেশগুলিতে শাসক জাতি ও শাসিত জাতির মধ্যে মর্যাদাগত ব্যবধান সহজেই চোখে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী দেশের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের যাবতীয় বিশেষ সুযোগ সুবিধা শাসক জাতি ভোগ করলেও শাসিত জাতি তা থেকে বঞ্চিত হয়।

**(৬) সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা ঃ** ঔপনিবেশিক শাসক জাতি সর্বদাই নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠতর এবং উপনিবেশে বসবাসকারী শাসিত জাতির সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট বলে মনে করত। ভারতে লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর আইন সচিব ও শিক্ষাবিদ মেকলে প্রাচ্যের সভ্যতাকে দুর্নীতি, অপবিত্র ও নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করেন।

**(৭) বিকৃত জাতীয়তাবাদ ঃ** ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে বিকৃত বা উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। এ ধরনের রাষ্ট্রের শাসকেরা নিজেদের দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠতম বলে মনে করে এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলিকে পদানত করার উদ্যোগ নেয়।

সুতরাং দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসনাধীনে বিভিন্ন উপনিবেশের অনগ্রসর জাতিগুলি নানান শোষণ-পীড়ন ও দুর্দশার শিকার হয়। ফলে জাতিগত ব্যবধানের সমর্থক ও নঞর্থক উভয় ধরনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

**নঞর্থক প্রভাব**

**(১) অমানবিকতা ঃ** ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসক জাতির দ্বারা এশিয়া ও আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ শাসিত জাতি দীর্ঘকাল ধরে ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবহেলা ও অমানবিকতার শিকার হয়। শাসিত জাতিগুলি নিজেদের দেশেই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে স্বীকৃত হয়।

**(২) জাতিগত শোষণ ঃ** উপনিবেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে জাতিগত ব্যবধান অনগ্রসর মানুষের উপর তীব্র শোষণ ও অত্যাচারের সূত্রপাত ঘটায়। উপনিবেশের পরাধীন জাতিগুলির উপর বিপুল পরিমাণে করের বোঝা চাপানো হয়। কৃষিব্যবস্থা, কুটিরশিল্প বিদেশি জাতিগুলির শোষণে ধ্বংস হয়। তীব্র আর্থিক শোষণ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি ঘটনা পরাধীন জাতিগুলিকে সীমাহীন দুরাবস্থায় ফেলে দেয়।

**(৩) দেশীয় ঐতিহ্যে আঘাত ঃ** নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গর্বিত শ্বেতাঙ্গ জাতি এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যে জোর আঘাত হানে। ফলে প্রাচীন বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লুপ্ত হতে শুরু করে।

**(৪) শ্রমিক রপ্তানি ঃ** পশ্চিমের শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলি প্রথম দিকে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশে রপ্তানি করে সেখানকার উৎপাদনমূলক কাজগুলি সচল রাখত। খামারগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসত।

**(৫) বৈষম্য ঃ** উপনিবেশে শাসক শ্বেতাঙ্গ ও শাসিত কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে তীব্র বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। শাসিত জাতিরা শাসক জাতির নিকট কখনো সুবিচার পায় না। যেমন সরকারি চাকুরি, আদালত সব শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত হত বিশেষভাবে।

**সদর্থক প্রভাব**

**পাশ্চাত্য শিক্ষার সান্নিধ্য ঃ** ঔপনিবেশিক শাসন প্রসারের ফলে প্রাচ্যের শিক্ষার ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এক নতুন দিক সংযোজিত হয়। খ্রিষ্টান মিশানারিরা ঔপনিবেশের মানুষদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসে শিক্ষার প্রসার এবং সমাজকল্যাণ মূলক কাজে উদ্যত হয়।

**জ্ঞানের প্রসার ঃ** ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক জাতিগুলি জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলি বাসিন্দাদের তুলনায় যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার এশিয়া ও আফ্রিকায় সঞ্চালিত হয়।

**শিল্পকলার অগ্রগতি ঃ** পাশ্চাত্যের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যর সংস্পর্শে এসে তাদের শিল্প সৃষ্টিতে নতুনত্ত্ব আনে।

**গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঃ** ব্রিটিশ চিন্তাবিদ্ লেনার্ড উলফ মনে করেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতাগুলি উপনিবেশে অত্যাচার ও শোষণ চালালেও, ইউরোপীয় সভ্য জাতিগুলি কালো মানুষদের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শে দীক্ষিত করেছিল।

**সংগীতে অগ্রগতি ঃ** প্রাচ্যের সংগীতের অনুরাগী হয়ে পড়েন পাশ্চাত্যের জাতিগুলি। বহুশিল্পী প্রাচ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

**নবজাগরণের সূচনা ঃ** ইউরোপের সভ্য জাতিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে আধুনিক গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রচারের ফলে নবজাগরণের সূচনা হয়।

**(iii) নানকিং-এর সন্ধি এবং টিয়েনসিনের সন্ধির মূল শর্তগুলি আলোচনা করো।**

**উঃ** চিনের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ইউরোপীয় বণিক জাতিগুলিকে প্রলুব্ধ করে, যে কারণে ষোড়শ শতকে পোর্তুগিজ এবং সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ, ইংরেজ, স্পেনীয়রা চিনে বাণিজ্য

কুঠি নির্মাণ করে। তবে চিনারা এইসব বিদেশিদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে মোটেই আগ্রহী ছিল না। তবুও বিভিন্ন বাধানিষেধ ও অপমানজনক শর্তাদি মেনে ইউরোপীয়রা একমাত্র চিনের ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ইতিমধ্যে আফিম বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সঙ্গে চিনের বিরোধ বাধে, যা ইতিহাসে অহিফেনের যুদ্ধ বা ইঙ্গ-চিন যুদ্ধ নামে পরিচিত। দুটি পর্বে এই যুদ্ধ হয়েছিল— (ক) প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খ্রিস্টাব্দ), (খ) দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ (১৮৫৬-৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অহিফেনের যুদ্ধে চিনকে পরাস্ত করে ব্রিটেন চিনের দুর্বল মাঞ্চু শাসককে অপমানজনক নানকিং সন্ধি (১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে) স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে এবং এই সন্ধির শর্তানুসারে—

(১) চিনের মাঞ্চু সরকার হংকং, কৌলুন দ্বীপ ব্রিটেনকে ছেড়ে দেয়।

(২) দক্ষিণ চিনের ক্যান্টন সহ পাঁচটি বন্দর ব্রিটেনকে বাণিজ্যের জন্য ছেড়ে দিতে হয়।

(৩) এই পাঁচটি বন্দরে ব্রিটিশ বণিকরা অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে।

(৪) ব্রিটেনের পথ ধরে আমেরিকা, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরে উৎসাহিত হয়।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে চিনের মাঞ্চু সরকার নানকিং সন্ধি অমান্য করলে দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ শুরু হয়।

**চিনা ভূখণ্ডে লুটপাট ঃ** রাশিয়া দূরপ্রাচ্যে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করলে রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাপান সামরিক বাধার সৃষ্টি করে। চিনের উপর রুশ ও জাপান সাম্রাজ্যবাদের থাবার আঘাত পড়লে ব্রিটেনসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ আশঙ্কা প্রকাশ করে যে গোটা চিনদেশকে রাশিয়া ও জাপান মিলে গ্রাস করবে। এমতাবস্থায় চিনের ভূখণ্ডে সহিংস লুঠপাঠ শুরু হয়ে। ঐতিহাসিক ভিনাক-এর মতে, ''তরমুজকে যেমন লোকে খণ্ড খণ্ড করে আহার করে, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি চিনা তরমুজকে তেমনি করে বাঁটোয়ারা করতে উদ্যত হয়।

নানকিংয়ের সন্ধির পর দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধে চিন পরাজিত হলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স টিয়েনথিনের অসম সন্ধির শর্ত চিনের উপর চাপিয়ে দেয়। এই সন্ধির দ্বারা (১৮৫৮)

(১) চিন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়।

(২) আরোও ১২টি বন্দর চিন বিদেশি বণিকদের জন্য খুলে দেয়।

(৩) রাজধানী পিকিংয়ে বিদেশি দূতাবাস স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয় চিন।

(৪) ছাড়পত্রের মাধ্যমে বিদেশিরা চিনের অভ্যন্তরে অবাধ ভ্রমণের এবং খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা চিনে বসবাস ও ধর্মপ্রচারের অনুমতি পায়।

(৫) বিদেশি বণিকেরা বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস পায়।

(৬) চিনে নির্দিষ্ট শুল্কের বিনিময়ে আফিমের ব্যবসা চিনে বৈধ বলে স্বীকৃত হয়।

(৭) চিনের অভ্যন্তরে বিদেশি বণিকদের অতি রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকৃত হয়।

অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে যদি দেশের মানুষ শিল্পকর্ম ছেড়ে চাষ-আবাদে জীবিকা অর্জন শুরু করে অথবা জাতীয় আয়ে কৃষিজ অংশ বাড়তে থাকে ও শিল্পজ অংশ কমতে থাকে তবে তাকে অব-শিল্পায়ন বলে। অবশ্য জাতীয়তাবাদী নেতা, বিশেষ করে দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ ও পরবর্তীকালে রজনী পাম দত্ত, গ্যাডগিল, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, বিপান চন্দ্র, অমিয় বাগচি প্রমুখ ঐতিহাসিক সাধারণভাবে ভারতীয় হস্তশিল্পের বিপর্যয়কে অব-শিল্পায়ন বলেছেন।

**অথবা**

**ঔপনিবেশিক ভারতে অবশিল্পায়নের কারণ এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করো।**

**উঃ** প্রাক্-শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে ভারতবর্ষে হস্ত ও কুটির শিল্পজাতসামগ্রী যথেষ্ট উন্নত ছিল। এইসব পণ্যদ্রব্যের চাহিদাও ছিল সারা ইউরোপ জুড়ে যথেষ্ট। ঢাকাই মসলিন গুণগত মানের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। ডেফো, তাঁর 'রবিনসন ক্রুশো' গ্রন্থে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন 'ইংল্যান্ডের ঘরে ঘরে, বসার ঘরে ও শোবার ঘরে সর্বত্র এই ভারতীয় পণ্য সামগ্রী প্রবেশ করেছে।' কিন্তু ভারতে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে দেশীয় শিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং কালক্রমে তা ধ্বংস হয়ে যায়। দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের এই কারণগুলি ছিল—

**(১) কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য ঃ** ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা দস্তকের অপব্যবহার শুরু করে বিনা শুল্কে বাংলার অবাধ বাণিজ্য করতে শুরু করে। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় অন্যান্য কোম্পানিকে হাটিয়ে দিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোম্পানির মূলনীতি ছিল সবচেয়ে কম দামে এদেশের কাঁচামাল ক্রয় করে চড়া দামে তা ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করা। এর ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

**(২) তুলার দাম বৃদ্ধি ঃ** সুতিবস্ত্র তৈরির জন্য যে তুলার প্রয়োজন হয়, কোম্পানির কর্মচারীরা তার উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে তা তাঁতিদের চড়া দামে বিক্রয় করত। চড়া দামে তুলো কিনে এবং কম দামে বিক্রি করে তাঁতিরা সর্বস্বান্ত হত।

**(৩) ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন ঃ** ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক চেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটলে ভারতের বাজারে ইউরোপীয় অন্যান্য বণিকদের অবাধ প্রবেশ ঘটে। ইউরোপে উৎপন্ন অনেক উন্নতমানের সস্তা দামের পণ্যে ভারতের বাজার ভরে যায়।

**(৪) শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ঃ** অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ড শিল্প বিপ্লব ঘটে যাওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ে অতি দ্রুত নানান উন্নত মানের দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় ভারতে উৎপন্ন দ্রব্য হেরে যাওয়ায় তা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে— ''ইউরোপের পাওয়ার লুমের আবিষ্কার ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসসাধনকে সম্পূর্ণ করেছে।

**(৫) অসম শুল্ক নীতি ঃ** ইংল্যাণ্ডের জিনিসপত্র যাতে ভারতে অবাধে আসতে পারে তার জন্য কোম্পানি আমদানি শুল্ক কমিয়ে দেয়। অন্যদিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ব্রিটেনে ভারত থেকে রপ্তানি করা পণ্যের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় শতাংশ। মসলিনের উপর শুল্ক ছিল শতাংশ, চিনির উপর শুল্ক ছিল চিনির দামের তিন থেকে চারগুণ। অসম এই শুল্ক নীতির কারণে দেশীয় শিল্প ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

**(৬) দেশীয় নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঃ** পলাশির যুদ্ধের পর ভারতে রাজা, জমিদার সহ অভিজাত শ্রেণির ক্রম অবলুপ্তি ভারতীয় কুটিরশিল্পের উপর চরম আঘাত হানে। কারণ এতদিন পর্যন্ত তারাই ছিল ভারতীয় কুটিরশিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

**(৭) কোম্পানির শোষণ ও তার কর্মচারীদের অত্যাচার ঃ** উইলিয়াম বোল্টস্ তাঁর রচনায় দেখিয়েছেন কীভাবে কোম্পানির কর্মচারী ও দালালরা তাঁতিদের অগ্রীম দাদন নিতে ও ভয় দেখিয়ে শুধুমাত্র ইংরেজ কোম্পানির জন্য সুতিবস্ত্র বুনতে বাধ্য করত। দাদন গ্রহণকারী তাঁতিরা লোকসান স্বীকার করেও বাজার থেকে ২০-৪০ শতাংশ কম দামে কোম্পানিকে তাদের বস্ত্র বিক্রি করতে বাধ্য করতে বাধ্য থাকত। এমনকি কোম্পানি কাঁচা তুলোর ব্যবসায় একচেটিয়াভাবে বাজারে দখল করে তাঁতিদের কাছে উচ্চ মূল্যে এই তুলো বিক্রয় করত।

**(৮) শিল্প সংরক্ষণ নীতি ঃ** ব্রিটিশ শিল্পপতিদের চাপে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য শিল্পক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি বলবৎ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে, ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে, ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে, ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন আইন পাশ করে ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের বাইরে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ভারতের রপ্তানিতে বাধার সৃষ্টি করে।

**(১) বেকারত্ব ঃ** দেশীয় কুটিরশিল্প ধ্বংসের ফলে ভারতের বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পী ও কারিগর কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। সরকারের অরণ্য আইনের বিরুদ্ধে রাম্পা জনজাতি যে বিদ্রোহের সূচনা করে তা রাম্পা বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

**(২) জমির উপর চাপ বৃদ্ধি ঃ** বেকার শিল্পী ও কারিগররা কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে কৃষিকাজে নিযুক্ত হলে জমির উপর চাপ বাড়ে। দেশে কৃষিজীবী ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

**(৩) কাঁচামাল রপ্তানি ঃ** অবশিল্পায়নের ফলে তারও শুধু এক কাচামাল রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে পরিচিত হয়। তুলো, রেশম, নীল সব ইংল্যাণ্ড বণিকরা সস্তায় ক্রয় করে বিদেশে চালান দিতে থাকে।

**(৪) নগরজীবন ধ্বংস ঃ** ভারতের প্রাচীন ও শিল্প সমৃদ্ধ নগর যথা ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট, মসুলিপত্তনম, তাঞ্জোর ,সপ্তগ্রাম জনবিরল হতে থাকে।

**(৫) দারিদ্র সংকট বৃদ্ধি ঃ** শিল্প বাণিজ্য ধ্বংসের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হলে ভারত এক দারিদ্র দেশে পরিণত হয়। দারিদ্র , দুর্ভিক্ষ, মহামারী ভারতে সংকট ডেকে আনে।

**দলিতদের আন্দোলনের বিবরণ ঃ** ভারতে হিন্দু সমাজ কাঠামোয় জাতভিত্তিক মানুষে মানুষে কালক্রমে এমন বিভেদ সৃষ্টি করেছিল যে সমাজের কিছু জাতি অধঃপতিত, অচ্ছুত হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এরাই দলিত নামে পরিগণিত। কোম্পানি আমলে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য এই দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে , যার মধ্যে অন্যতম ছিল—

**(১) যুক্তপ্রদেশের জৌনপুরের দলিত আন্দোলন ঃ** যুক্তপ্রদেশের জৌনপুর অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম চামার অধ্যুষিত ছিল। তারা ভূমিহীন খেতমজুর বা সামান্য জমি চাষ করে জীবন কাটাত। তাদের সামাজিক অবস্থানও ছিল নীচে। এই দুরবস্থা দূর করার এবং নিজেদের সামাজিক অবস্থান ব্রাহ্মণদের সমপর্যায়ভুক্ত করার জন্য তাদের মধ্যে শিব-নারায়ণ ধর্মমত গড়ে ওঠে। এই মত অনুসারীরা শিব-নারায়ণ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হন। তারা ব্রাহ্মণদের অনুকরণ করে।

**(২) এজহাবা সম্প্রদায়ের আন্দোলন ঃ** দক্ষিণ ভারতের কেরালার এজহাবা সম্প্রদায় ছিল দলিত। তারা শ্রী নারায়ণ গুরুর নেতৃত্ব সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। তারা হিন্দু হলেও তাদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না, মন্দিরের চলার পথ দিয়ে চলার অধিকার ছিল না। তারা প্রথম ভাইকম সত্যাগ্রহের মাধ্যমে পথ চলার অধিকার লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুকরণ করে নিজেদের সামাজিক অবস্থান উন্নতির চেষ্টা করে।

**(৩) নাদার সম্প্রদায়ের অন্দোলন ঃ** দক্ষিণ ভারতে তামিলনাড়ুর দক্ষিণে নাদার সম্প্রদায় অনুরূপ আন্দোলন করে। এই সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ ব্যবসা বা অন্য কাজ করে আর্থিক ভাবে সচ্ছল হয়ে ওঠে এবং নিজেদের হীন সামাজিক অবস্থানকে উন্নত করার চেষ্টা করে। এরপর মন্দিরে প্রবেশের (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে) দাবিকে কেন্দ্র করে উঁচু জাতের সঙ্গে দলিতদের দাঙ্গা বাধে।

**(৪) দলিত পল্লি সম্প্রদায়ের অন্দোলন ঃ** তামিলনাড়ুর উত্তরে দলিত পল্লি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। খেতমজুর, পশুচারণ ও বিভিন্ন কাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সচ্ছলতা লাভ করে নিজেদের বানিয়া ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। তারা ব্রাহ্মণদের অনুকরণ করে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করে।

**(৫) মাহার সম্প্রদায়ের অন্দোলন ঃ** মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায় ছিল দলিত গোষ্ঠী। ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর এই সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে

বাবা ভালংকার নামে একজন প্রাক্তন সেনাকর্মীর নেতৃত্বে মাহাররা জোটবদ্ধ হয়। ভালংকর তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সেনাবাহিনী ও সরকারি কাজে নিয়োগের দাবি জানায়।

**(iv) উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করো।**

**উঃ** উনিশ শতকে ভারতবাসীর দুরবস্থা দূর করার জন্য জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের চেষ্টা হয়। বিস্তার ঘটে পাশ্চাত্য শিক্ষার; গড়ে ওঠে সাহিত্য, প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র, সূচনা হয় ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের। চিত্রকলা বিজ্ঞানচর্চার নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়। ফলে ভারতে নবজাগরণের সূচনা ঘটে। যেহেতু বাংলাদেশে এই সমস্ত উপাদানগুলি প্রবল ছিল তাই নবজাগরণের সূচনা বাংলাদেশেই প্রথম হয়।

নবজাগরণের প্রকৃতি ঃ উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণকে কেউ কেউ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালীয় নবজাগরণের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। তা ছাড়া বাংলার নবজাগরণের প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা, গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। যেমন—

**(১) বাস্তব নবজাগরণ ঃ** উনিশ শতকে বাংলায় প্রকৃতই নবজাগরণ ঘটেছিল বলে অনেকেই মনে করেন। বাংলার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক জাগরণকে স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর গ্রন্থে দ্বিধাহীনভাবে 'Renaissance' বা 'History of Bengal' নবজাগরণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বাংলার নবজাগরণকে ইতালির নবজাগরণের চেয়ে ব্যাপক, গভীর ও বৈপ্লবিক বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার, অম্লান দত্ত প্রমুখ বাংলার নবজাগরণের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করেও একে 'নবজাগরণ' বলে মেনে নিয়েছেন।

তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজা রামমোহন রায় এক চিঠিতে আলেকজাণ্ডার ডাফকে লিখেছিলেন– ''আমি ভাবতে শুরু করেছি যে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মতো কিছু একটা ভারতে ঘটতে চলেছে''।

**(২) বাংলার নবজাগরণ প্রকৃত নবজাগরণ নয় ঃ** অনেক ঐতিহাসিক বাংলার নবজাগরণের কথা স্বীকার করলেও অনেকে আবার একে প্রকৃত নবজাগরণ বলতে রাজি নন। যেমন—

**(ক) তথাকথিত নবজাগরণ ঃ** প্রখ্যাত পণ্ডিত অশোক মিত্র ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আদমশুমারি তৈরির সময় বাংলার উনিশ শতকে নবজাগরণকে 'তথাকথিত নবজাগরণ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, এই জাগরণ শহর কলকাতার মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, গ্রামীণ বাংলার জনগণকে তা স্পর্শ করতে পারেনি।

**(খ) ইউরোপীয় নবজাগরণের সমতুল্য নয় ঃ** গবেষক সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, ''বাংলায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল ইউরোপের আন্দোলন থেকে ভিন্ন এবং বিপরীতমুখী''। তাঁর মতে আমাদের আধুনিক যুগের

লেখকগণ ইউরোপের অনুকরণে সোহাগভরে বাংলার নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনটির নাম দেন 'নবজাগরণ'। ইউরোপের নবজাগরণ ছিল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে কিন্তু বাংলার নবজাগরণ ছিল জমিদার ও মধসত্ত্বাভোগীদের একত্রিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের আন্দোলন।

**(গ) ঐতিহাসিক প্রতারণা ঃ** ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নবজাগৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, ''উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ছিল একটি মিথ্যাচার''। নবজাগরণকে তিনি একটি 'ঐতিহাসিক প্রতারণা' বলে অভিহিত করেছেন।

- **নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা ঃ** উনিশ শতকে বাংলার বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। যথা—

(১) ইতালির ফ্লোরেন্স নগরী ইউরোপের নবজাগরণে যে ভূমিকা পালন করে, বাংলার কলকাতা তা করতে পারেনি। ইতালির ফ্লোরেন্স ছিল স্বাধীন নগরী। অপরদিকে কলকাতা গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ঔপনিবেশিক কেন্দ্র হিসেবে। স্বভাবতই ফ্লোরেন্সের মতো স্বাধীন মানসিকতা ও শিল্পীমন কলকাতার ছিল না।

(২) উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। কৃষক-শ্রমিকসহ সমাজের একটি বড়ো অংশ এই নবজাগরণের শরিক হতে পারেনি।

(৩) বাংলার নবজাগরণ ছিল মূলত বর্ণ-হিন্দুদের, মুসলিম সমাজ এর বাইরে ছিল।

(৪) বাংলার নবজাগরণের প্রবক্তরা বাংলার সমাজকাঠামো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করতে পারেননি।

(৫) বাংলার নবজাগরণ মূলত সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেই প্রসারিত হয়েছিল। শহরের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই জন্য ড. অনিক শীল একে 'এলিটিস্ট আন্দোলন' বলে অভিহিত করেছেন।

## বিভাগ - খ

**(v) রাওলাট আইনের উদ্দেশ্য কী ছিল ? গান্ধিজি কেন এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন ?**

**উঃ সূচনা :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী গণ আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার যে সমস্ত দমনমূলক আইন প্রবর্তন করেছিল। তার সার্থক প্রয়াস ছিল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত রাওলাট আইন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইংল্যান্ডের বিচারপতি স্যার সিডনি রাওলাট-এর সভাপতিত্বে পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটি 'সিডিশন কমিশন' বা রাওলাট কমিশন গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি দমনমূলক বিল উত্থাপিত হয়। ভারতীয় সদস্যদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৮ মার্চ বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই রাওলাট আইন (Rowlatt Act) নামে পরিচিত।

**উদ্দেশ্য ঃ** ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদ, গণ আন্দোলন, বিপ্লবী কার্যকলাপ প্রভৃতি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই কুখ্যাত রাওলাট আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে যে সমস্ত ধারা রাখা হয় তা হল—

(১) সরকার বিরোধী যে-কোনো প্রচারকার্য দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

(২) সন্দেহভাজন যে-কোনো ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাবে।

(৩) গ্রেপ্তারের পর বিনা বিচারে তাদের অনির্দিষ্টকাল আটকে রাখা বা নির্বাসন দেওয়া যাবে।

(৪) বিনা পরোয়ানায় যে-কোনো ব্যক্তির বাড়ি সরকার তল্লাশি করতে পারবে।

(৫) বিশেষ আদালতে সন্দেহভাজন অপরাধীর বিচার হবে। বিচারকগণ কোনো জুরির সহায়তা এবং কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই বিচার করতে পারবে।

(৬) রাওলাট আইনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চতর আদালতে আপিল করা যাবে না।

(৭) রাওলাট আইনে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে মুক্তির জন্য অর্থ জমা দিতে হবে।

(৮) কোনো সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে পারবে না।

এইভাবে রাওলাট আইনের দ্বারা ভারতীয়দের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত করা হয়।)

**ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া :** এই অমানবিক কালো আইনের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদেরছড় ওঠে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের আলস্য মহম্মদ আলি জিন্নাহ, সাজাহার-উল-হক, মদনমোহন মালব্য আইন পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', মাদ্রাজের হিন্দু, 'দি নিউ ইন্ডিয়া', লাহোরের 'পাঞ্জাবি', বোম্বাই-এর

'বোম্বাই ক্রনিকল' প্রভৃতি সংবাদপত্র এই আইনের প্রতিবাদ করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা', এই আইনকে 'এক ভয়াবহ ভ্রান্তি' ও কেশরী পত্রিকায় 'উৎপীড়নের দানবীয় যন্ত্র' বলে অভিহিত করে।

গান্ধিজি অত্যাচারী রাওলাট আইনের প্রতিবাদ করে বলেন যে, ''যে সরকার শান্তির সময় এই ধরনের নির্মম আইনের আশ্রয় নিয়েছে, সেই সরকার কখনোই নিজেকে 'সভ্য সরকার'বলে দাবি করতে পারে না। তিনি এই আইনকে ''উকিল নেহি, দলিল নেহি, আপিল নেহি'' বলে মন্তব্য করেন। জিন্নাহ তৎকালীন ভাইসরয়কে লেখা একটি চিঠিতে মন্তব্য করেন যে, এই আইনের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের প্রধান আদর্শকে ধ্বংস করা হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি নারায়ণ চন্দ্রভারকার প্রমুখ এই আইনকে অনাবশ্যক ও 'অসংগত' বলে অভিহিত করেছেন।)

নগ্ন দমনমূলক এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. ডডওয়েল বলেছেন যে, ''এক সংকটজনক মুহূর্তে কুখ্যাত রাওলাট আইন ভারতে সর্বজনীন প্রতিরোধ গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল''।

**(vi) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান পর্যালোচনা করো।**

**উঃ** ভারতের রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাব উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। শিক্ষাগুরু বেণিমাধব দাস, রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু চিত্তরঞ্জন দাস ও সর্বোপরি আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণাতেই I. C. S. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেও লোভনীয় চাকুরি ত্যাগ করে দেশমাতার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। ছাত্রাবস্থাতেই সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ বিরোধী মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যে কারণে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের গান্ধিপন্থী ব্যক্তিবর্গ তাঁর কাজে চরম অসহযোগিতা করলে তিনি ওই পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই 'ভারত সুরক্ষা আইনে' সুভাষচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করেন। কয়েকমাস পরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে তাঁর বাসভবনে নজরবন্দি করে রাখা হয়। সেখান থেকে ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি গৃহত্যাগ করেন। পুলিশের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু গিয়াসউদ্দিনের ছদ্মবেশে কাবুল হয়ে সন্ধ্যেয় মস্কোয় উপস্থিত হন। রুশ প্রধান স্ট্যালিন-এর নিকট থেকে কোনো সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় তিনি জার্মানির উদ্দেশ্যে রওনা হন।

**জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র :** সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধান হিটলার ও ইতালির রাষ্ট্রপ্রধান মুসোলিনির সাথে সাক্ষাৎ করেন। উভয় রাষ্ট্রপ্রধান তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বতোভাবে সহয়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেন। সুভাষচন্দ্র বসু জার্মান সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায়—

(ক) বার্লিনে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে আজাদ হিন্দুস্থান বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন নাম্বিয়ার নামে একজন দেশপ্রেমিক। সুভাষচন্দ্র বসু এই বেতার কেন্দ্র থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচার চালাতে থাকেন।

(খ) জার্মানির হাতে বন্দি ৪০০ ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 'স্বাধীনতা ভারতীয় লিজন' (Free India Legion) নামে এক সৈন্যদল গঠন করেন। এই সেনাদল সুভাষচন্দ্র বসুর দেশপ্রেম ও বিপ্লবী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সর্বপ্রথম তাকে। 'নেতাজি' অভিধায় ভূষিত করে এবং 'জয়হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে অভিবাদন জানায়।

**জাপানে সুভাষ বসু :** ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আহ্বানে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের রাজধানী টোকিওতে হাজির হন (১৩ জুন ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকী তোজো তাকে সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

এখানে জাপানের হাতে বন্দি প্রায় ৪০,০০০ ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নিয়ে রাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন মোহন সিং যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন তা ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন। সুভষচন্দ্র বসু এই বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাদের আত্মত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও ঐক্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে কতগুলি বিগ্রেডে বিভক্ত করেন। যেমন- (ক) গান্ধি ব্রিগেড (খ) আজাদ ব্রিগেড (গ) নেহরু ব্রিগেড (ঘ) ঝাসি রাণী ব্রিগেড ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্রিগেডে প্রধানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- শাহনওয়াজ খান, গুরুবন্ত সিং ধিলন, প্রেমকুমার সায়গল, ড লক্ষ্মী স্বামীনাথন প্রমুখ।

**আজাদ হিন্দ সরকার গঠন :**১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ সরকার' স্থাপিত হয়। জাপান, জার্মানি, ইটালি, থাইল্যান্ডসহ ন-টি দেশে এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এই আজাদ হিন্দ সরকার ২৩ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো সহযোগিতার নিদর্শন স্বরূপ আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ-হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তুলে দেন। নেতাজি ৩১ ডিসেম্বর এই দুটি দ্বীপের নাম রাখেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ। এই সময় নেতাজি দেশবাসীকে মুক্তি যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার আবেদন জানিয়ে ঘোষণা করেন ''তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব (Give me Blood, I shall give you freedom)'।

**দিল্লি চলো অভিযান :** নেতাজি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ৪ জানুয়ারি রেঙ্গুনে পৌঁছান এবং সেখানেই তিনি তার বাহিনীর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এরপর শুরু হয় আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত অভিযান। নেতাজি তাঁর বাহিনীকে আহ্বান জানান-''দিল্লি চলো'', ''দিল্লির পথ স্বাধীনতার পথ'', ''কদম কদম বাঢ়ায়ে যা''।

এরপর আজাদ হিন্দ বাহিনী জাপানের সহযোগিতায় ওই বছরের মার্চ মাসে ভারত সীমান্তে মউডবা ঘাঁটিটি ব্রিটিশদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়। ক্রমে তারা মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল, নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা দখল করে (৬ এপ্রিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) ভারতের সীমানা থেকে প্রায় ১৫০ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

**আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণ ঃ** ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ ৬ আগস্ট ও ৯ আগস্ট)। স্বদেশ রক্ষার জন্য জাপান, ব্রহ্মদেশ থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয় ও ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট জাপান মিত্র শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জাপানের সহযোগিতা না পাওয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। নেতাজি আরও একবার শক্তি পরীক্ষার আশায় বিমানে উঠলেন। কন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত হল। প্রচারিত হল তাইহোকু বিমান বন্দরে নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

**আজাদ হিন্দ বাহিনীর অবদান :** ভারতবাসী নেতাজির হাত ধরে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। নেতাজির সারা জীবনের আত্মত্যাগ ঋষিতুল্য। যে কারণে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে, ''ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অমিত বিক্রম ও শৌর্য ছিল অতুলণীয়।''

(১) বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও তারা উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ১৫০ বর্গমাইল এলাকাকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছিল।

(২) আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনারা যুদ্ধে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তাতে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিল যে ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

৩) আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রবল বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেশবাসীর মনে প্রবল জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

৪) আজাদ হিন্দ বাহিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ভারতে নৌ-বিদ্রোহ ঘটে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে প্রবল বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

**(vii) সুয়েজ সংকটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।**

**উঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। জাতীয়তাবাদ দেশে দেশে জয়যুক্ত হয়। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে

কেন্দ্র করে এক সংকট সৃষ্টি হয় যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কায়েমী স্বার্থের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তাঁর দৃষ্টান্ত ছিল মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ (২৬ জুলাই ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ)।

**সুয়েজ সংকটের কারণ :** গামাল আবদেল নাসের ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে মিশরের ক্ষমতা দখলের পর থেকে বিভিন্ন কারণে পশ্চিমি শক্তিবর্গের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে যা সুয়েজ সংকটের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।

(১) মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুয়েজ খালের নিরাপত্তার জন্য এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সেনা মোতায়েন থাকায় সুয়েজ খাল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মিশরের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

(২) আফ্রিকায় অবস্থিত ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়ায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ শুরু হলে নাসের বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। এতে নাসের উপর ফ্রান্স ক্ষুব্ধ হয়।

(৩) মধ্যপ্রাচ্যে রুশ আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আমেরিকার নেতৃত্বে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ চুক্তি (CENT0) স্বাক্ষরিত হলে মিশর এই চুক্তি থেকে দূরে থাকে। এতে পশ্চিমি শক্তিজোট অসন্তুষ্ট হয়।

(৪) মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদের বিরোধী ইজরায়েলের উত্থান নাসের মেনে নিতে পারেনি।

(৫) পশ্চিমি শক্তিবর্গের কাছে বারংবার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য চেয়েও মিশর ব্যর্থ হয়। ফলে রাশিয়ার সাথে মিশরের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।

(৬) ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে খনন শুরু হওয়া সুয়েজ খাল দিয়ে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাণিজ্যিকভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হয় এবং Universal Suez Canal Company এক চুক্তির ভিত্তিতে ৯৯ বছরের মেয়াদে এই খাল পরিচালনার দায়িত্ব পায়। মিশরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও সুয়েজ খাল থেকে আদায় অর্থের খুব সামান্য অংশ মিশর পেত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ও পরিস্থিতিতে নাসের, সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন—

(ক) মিশর সুয়েজ খালের জাতীয়করণ করছে এবং এই খালের পরিচালনা করবেন তিনি নিজে।

(খ) সুয়েজ খাল থেকে সংগৃহীত অর্থ আসওয়ান বাঁধ নির্মাণে ব্যয় করা হবে।

(গ) কোম্পানির বিদেশি অংশীদারদের প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

(ঘ) আন্তর্জাতিক যোগসূত্র হিসেবে সব দেশের জাহাজ এই জলপথ ব্যবহার করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাব : সুয়েজ সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তা হল—

**পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতিক্রিয়া :** মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসেরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণ ঘোষণায় সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেননা এতে পশ্চিমি জোটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক উইলক্রিড ন্যাপ বলেন যে, এই জাতীয়করণ ঘোষণার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে ভীতি, বিরোধিতা ও কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে যায়।

সুয়েজ খাল জাতীয়করণের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ফলে এই ঘটনায় এই দুই রাষ্ট্র ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়। তখন তারা উভয়ে মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল আমেরিকার লক্ষ্য।

লণ্ডন সম্মেলনে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী ২২টি দেশ যোগদান করে। ব্রিটেন-ফ্রান্স সহ ১৮টি দেশ জাতীয়করণের পরিবর্তে সুয়েজখালের ওপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়। রাশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ জাতীয়করণের পক্ষে মত জানায়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস 'সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সংস্থা' গঠন করে তার মাধ্যমে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়। তখন মিশরের এই সুয়েজ সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট প্রেসিডেন্ট নাসের পেশ করেন।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও উজরায়েল একসাথে মিশর আক্রমণ করলে জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ বিরতির ডাক দেয়। তার নির্দেশে মিশর থেকে সৈন্য অপসারণ করা হয়। ভারত এই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নাসেরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটেনের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়।

**অথবা**

**পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েতীকরণের উদ্দেশ্য কি ছিল? বিভিন্ন দেশে এর কি প্রভাব পড়েছিল?**

**উঃ পূর্ব ইউরোপে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ঃ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সোভিয়েত রাশিয়ার লালফৌজ পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চল জার্মানির হাত থেকে মুক্ত করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া এসব অঞ্চলে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রসার ও রাশিয়ার অনুগত কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রাশিয়া তার ভূখণ্ড সংলগ্ন লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি ছোটো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে সরাসরি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত

করে। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, পোল্যান্ড ও পূর্ব জার্মানি—এই আটটি দেশে রুশ-অনুগত কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

**রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঃ**

পূর্ব ইউরোপে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পিছনে রাশিয়ার যেসব উদ্দেশ্যগুলি ছিল তা হল—

১। **সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ঃ** স্ট্যালিন মনে করতেন যে, সকল বিজেতাই বিজিত অঞ্চলের ওপর নিজেদের মতাদর্শ ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই পূর্ব ইউরোপের বিজিত অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা যুক্তিসংগত। এজন্য সাম্যবাদী ভাবধারার ধারাবাহিক প্রসারের জন্য এই অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল।

২। **শক্তিশূন্যতা ঃ** যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের আর্থিক ও সামরিক শক্তি নিঃশেষ হওয়ার ফলে ইউরোপে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় রাশিয়া তা কাজে লাগাতে পূর্ব ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে।

৩। **নিরাপত্তা বলয় ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ইউরোপের ওপর দিয়ে জার্মানির হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের ঘটনা রুশ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছিল। পূর্ব ইউরোপে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে রাশিয়া নিজের জন্য একটি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল।

৪। **অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঃ** যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য পূর্ব ইউরোপের সম্পদের ব্যবহার; এবং এখানকার বাজার দখল রাশিয়ার কাছে খুবই প্রয়োজন ছিল।

৫। **কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবসান ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া কূটনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজস্ব প্রভাব-বলয় তৈরি করে রাশিয়া সেই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে চেয়েছিল।

স্ট্যালিন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রাজা মাইকেলকে কমিউনিস্টদের নিয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের নির্দেশ দেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রুমানিয়ার সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট সমর্থিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। ক্ষমতা লাভ করে নতুন সরকার কমিউনিস্ট বিরোধীদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার শুরু করে। **রাজা মাইকেলের পদত্যাগ :** নতুন সরকারের তীব্র অত্যাচারে রাজা মাইকেল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে সকল বিরোধীদের নিধন করে, একমাত্র অনুগতদের নিয়ে রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি (Rumanian Workers' Party) গঠিত হয়।

**স্বদেশভূমি ফ্রন্ট ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়ায় কমিউনিস্ট, অকমিউনিস্ট সকলকে নিয়ে সোভিয়েত-অনুগত একটি 'স্বদেশভূমি ফ্রন্ট' (Fatherland Front) গঠন করা হয়। ২) কমিউনিস্ট নিধন :এরপর ক্রমে অকমিউনিস্টদের নিধন শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী নেতা নিকোলা পেটকভ এর নেতৃত্বে 'পেজেন্টস্ ইউনিয়ন' দল কমিউনিস্টদের প্রবল বিরোধিতা করে।

**চেকোশ্লোভাকিয়া :** প্রেসিডেন্ট নেনেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের পর চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূতপূর্ব অকমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেনেস রাশিয়া থেকে ফিরে এসে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন।

বেনেসের সরকার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকার ঘোষিত মার্শাল পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলে রাশিয়া শঙ্কিত হয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সাম্যবাদ-বিরোধী সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেখানে রুশ আধিপত্য বিনষ্ট হবে। ফলে স্ট্যালিনের নির্দেশে চেকোশ্লোভাকিয়ায় অকমিউনিস্ট নিধন শুরু হয়। **কমিউনিস্ট অফিসার নিয়োগ:** স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নোসেক ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজধানী প্রাগের আটজন পুলিশ অফিসারকে পদচ্যুত করে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন নতুন আটজন অফিসার নিয়োগ করেন। সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী এই ঘটনার প্রতিবাদ করে পদচ্যুত অফিসারদের পুনর্নিয়োগের দাবি জানান। **অকমিউনিস্ট মন্ত্রীদের পদত্যাগ :** কমিউনিস্ট প্রধানমন্ত্রী গোটওয়াল্ড এবিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সমর্থন করলে বেশ কয়েকজন অকমিউনিস্ট মন্ত্রী পদত্যাগপত্র পেশ করেন। দেশে কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্টদের মধ্যে প্রবল বিরোধ শুরু হয়। কমিউনিস্ট পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট চলতে থাকে। শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বেনেস মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র গ্রহণে বাধ্য হন এবং দেশে কমিউনিস্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

**(viii) বি-উপনিবেশীকরণ বলতে কি বোঝায়? এর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।**

**উঃ বি-উপনিবেশীকরণ বা অব-উপনিবেশীকরণ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দেশের আত্মপ্রকাশ হওয়ার ঘটনাকেই অব-উপনিবেশীকরণ বলা হয়। Spring Hall তাঁর 'Encyclopedia of social science'-এর সাম্রাজ্যবাদ শীর্ষক অংশে অব-উপনিবেশবাদ বলতে বুঝিয়েছেন, ভূতপূর্ব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সমর্পণ অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা সাম্রাজ্যের হাত থেকে জাতি রাষ্ট্রগুলির হাতে সমর্পণ করা। অব-উপনিবেশীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যে ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শাসক তাদের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে প্রত্যাহার করে নেয়।

এককথায় উপনিবেশবাদের বা ঔপনিবেশিক নীতির বিপরীত হল বি-উপনিবেশবাদ বা অব-উপনিবেশীকরণ। যখন কোনো মাতৃদেশ বিভিন্ন কারণে তার উপনিবেশগুলিকে একে একে স্বাধীনতাদানের নীতি গ্রহণ করে তখন তাকে বি-উপনিবেশিকরণ বা

Decolonisation বলে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত মারিস জুলিয়াস বন সর্বপ্রথম 'Decolonisation' শব্দটি ব্যবহার করেন।

অব-উপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়া আধুনিক বিশ্ব তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এক নতুন যুগ সূচিত করেছিল। এর পরিণতিতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের পর মাত্র ৩৫ বছরের মধ্যে অসংখ্য পরাধীন দেশ ও উপনিবেশ ক্রমে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমগ্র মানবসভ্যতার ইতিহাসে অব-উপনিবেশিকরণের মতো এত দ্রুততার সঙ্গে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

**অব-উপনিবেশীকরণের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা :** অব-উপনিবেশীকরণের তিন ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যেমন **(১) জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :** এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেশজ প্রতিরোধ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মাধ্যমে উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদীরা নিপীড়নের সঙ্গে আপোস নীতি গ্রহণ করে। তাঁরা পরিকল্পিতভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটায় বলে মনে করা হলেও এজাতীয় পদক্ষেপ ছিল অনিবার্য। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতে নিপীড়ন থেকে আপোষ নীতিতে উত্তরণ ঘটেছিল। **(২) আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও অব-উপনিবেশীকরণ :** এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বজায় রাখা কার্যত দুরূহ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আটলান্টিক চার্টারে (১৯৪১ খ্রি.) উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার উল্লেখ এবং ১৯৬০ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঔপনিবেশিক শাসনকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির দুর্বল হয়ে পড়া এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এলিটগোষ্ঠীর স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনও অব-উপনিবেশীকরণের পথ প্রশস্থ করে। **(৩) আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা :** এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা ও জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিবেশগুলি অর্থনৈতিক, সামরিক ও আন্তজাতিক দিক থেকে অর্থহীনও বোঝাতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী থেকে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির পতন ঘটতে থাকে এবং বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য লক্ষ করা যায়।

**অব-উপনিবেশীকরণের সামাজিক তাৎপর্য**

১। **বর্ণবৈষম্যবাদের গতিরোধ :** ঔপনিবেশিক শাসনকালে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশের বাসিন্দারা বর্ণবৈষম্যবাদের শিকার হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের সঙ্গে শাসিত কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর বিস্তর ব্যবধান ও অসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অব-উপনিবেশীকরণের ফলে জাতিবৈরিতা ও বর্ণবৈষম্যবাদের গতি রুদ্ধ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, রোডেশিয়া থেকে ক্রমে বর্ণবৈষম্যবাদ বিদায় নিতে থাকে।

২। **অস্থির পরিস্থিতির উদ্ভব :** কিছু কিছু উপনিবেশ, বিশেষ করে আফ্রিকার বেশ কিছু উপনিবেশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং অভ্যন্তরীণ বিভেদ-দ্বন্দ্বে এতটাই দুর্বল ছিল যে, তারা স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তারা ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও দেশে সঠিক সুস্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধের দিকে মোড় নেয়।

৩। **এলিট গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি :** ঔপনিবেশিক শক্তি বিদায় নেওয়ার পর সদ্য-স্বাধীন বহু রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা সেদেশের শিক্ষিত ও ধনী এলিট গোষ্ঠীর করায়ত্ত হয়। তারা দেশে নিজ গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। দেশের সাধারণ দরিদ্র মানুষের সঙ্গে এই সমস্ত গোষ্ঠীর সামাজিক স্তর ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিস্তর পার্থক্য ছিল।

**অব-উপনিবেশীকরণের রাজনৈতিক তাৎপর্য**

১। **তৃতীয় বিশ্বের উত্থান :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু উপনিবেশ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শাসনমুক্ত হয়, অর্থাৎ অব-উপনিবেশীকরণ ঘটে। এর ফলে এইসব মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। সদ্য-স্বাধীন এইসব দেশতৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত। তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলি পৃথিবী থেকে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করতে যথেষ্ট উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্য দূর করতে জাতিপুঞ্জের সাহায্য নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জের ১৭৯টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১০০টি সদস্য রাষ্ট্রই ছিল সদ্য-স্বাধীন। তৃতীয় বিশ্বের উত্থানের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিধি, কার্যাবলির যথেষ্ট প্রসার ঘটে ও তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(২) **জাতিভিত্তিক নতুন বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব :** অব-উপনিবেশীকরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বের রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অব-উপনিবেশীকরণের ফলে পুরোনো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলির অধীনতা ছিন্ন করে জাতিভিত্তিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ অসংখ্য রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলে নতুন রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

(৩) **সাম্রাজ্যবাদের গতিরোধ :** অব-উপনিবেশীকরণের ফলে সাম্রাজ্যবাদী অধীনতা ছিন্ন করে অসংখ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। সদ্য-স্বাধীন এসব রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদের কুফল ভোগ করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা লাভের পরও এসব দেশ অন্যান্য পরাধীন দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন জুগিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৪) **রাজনীতিক প্রসার :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরোপ মহাদেশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি প্রসারিত ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় বহু নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটলে পূর্বেকার ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এসব রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রক্ষা করতে বাধ্য হয়। এভাবেই অব-উপনিবেশীকরণের ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির দিগন্ত বহুদূর প্রসারিত হয়। ইউরোপের বাইরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যেও সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যাও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থান করে নেয়।

(৫) **নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় অর্থাৎ অঞ্চল বা উপনিবেশগুলির অব-উপনিবেশীকরণ ঘটে। এর ফলে সদ্য স্বাধীন এসব (দেশে) অঞ্চলে যে শক্তিশূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণ করতে বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া এগিয়ে আসে। ফলে এই বৃহৎ শক্তি দুটির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায়।

(৬) **ঠান্ডা লড়াইয়ের প্রসার :** ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কবল থেকে মুক্ত হলেও সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়া নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারে এবং আমেরিকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদের প্রসারে সক্রিয় উদ্যোগ নেয়। আদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দখলদারির কারণে সৃষ্ট ঠান্ডা লড়াইয়ের ফলে সদ্যস্বাধীন এসব রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই এসব দেশে নিজেদের স্বার্থে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে এলে দেশগুলি আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে সংঘটিত ঠান্ডা লড়াইয়ের বৃত্তে প্রবেশ করে।

**অব- উপনিবেশীকরণের অর্থনৈতিক তাৎপর্য**

**অর্থনৈতিক দুর্বলতা ঃ** ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দীর্ঘদিন ধরে তাদের অধীনস্থ উপনিবেশগুলিকে শোষণ করার ফলে উপনিবেশগুলি অর্থনৈতিকভাবে একসময় নিঃস্ব হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তির ওপরই এই উপনিবেশগুলি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে এ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে দেশের কৃষি উৎপাদন, শিল্পায়ন প্রভৃতি ব্যাহত হয় এবং সামগ্রিক উন্নয়ন থমকে যায়। সদ্য-স্বাধীন এসব দেশে বেকারত্ব এবং কোথাও কোথাও খাদ্যাভাব তীব্র আকার ধারণ করে।

**নয়া উপনিবেশবাদ ঃ** ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর সদ্য স্বাধীন এই দেশ নিরাপত্তা, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রভৃতির প্রয়োজনে ইউরোপ বা অন্যান্য স্থানের বৃহৎ শক্তিগুলির ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। সুযোগ বুঝে বৃহৎ শক্তিগুলি

সদ্য-স্বাধীন এ দেশে অর্থনৈতিক সহায়তা দান করে সেখানে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও পরোক্ষভাবে শোষণ বৃদ্ধি করে। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনতা ছিন্ন করার পরও এসব রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের শিকার হয়। এই সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অর্থনৈতিক সহায়তাদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার ঘটনাই হল নয়া-উপনিবেশবাদ।

## বিভাগ - খ

**1. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ডানদিকে নীচে প্রদত্ত বাক্সে লেখো : 1 × 24 = 24**

**(i) "ইতিহাস একটি বিজ্ঞান-এর বেশিও নয়, কমও নয়।" — এটি কার উক্তি?**

(a) র‍্যাঙ্কে (b) ই. এইচ. কার

(c) জেমস মিল (d) বিউরী

উঃ **(d) বিউরী**

**(ii) 'একাত্তরের-ডায়েরী' নামক স্মৃতিকথার রচয়িতা**

(a) সুফিয়া কামাল (b) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(c) নারায়ণ সান্যাল (d) দক্ষিণারঞ্জন বসু

উঃ **(a) সুফিয়া কামাল**

**(iii) ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কোন বন্দরে প্রথম পদার্পণ করেন?**

(a) দমন (b) গোয়া

(c) কালিকট (d) কোচিন

উঃ **(c) কালিকট**

**(iv) স্তম্ভ-১ এর সাথে স্তম্ভ-২ মেলাও :**

| | **স্তম্ভ-১** | | **স্তম্ভ-২** |
|---|---|---|---|
| (i) | সাম্রাজ্যবাদ : একটি সমীক্ষা | (A) | অ্যাডাম স্মিথ |
| (ii) | হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া | (B) | ভি. আই. লেনিন |
| (iii) | ওয়েলথ অফ নেশনস | (C) | জেমস মিল |
| (iv) | সাম্রাজ্যবাদ : পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর | (D) | জে. এ. হবসন |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-D, (ii)-C, (iii)-A, (iv)-B (b) (i)-D, (ii)-B, (iii)-A, (iv)-C

(c) (i)-B, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-A (d) (i)-C, (ii)-D, (iii)-B, (iv)-A

উঃ **(a) (i)-D, (ii)-C, (iii)-A, (iv)-B**

**(v) বক্সারের যুদ্ধে কে জড়িত ছিলেন না?**

(a) সিরাজ-উদ-দৌল্লা (b) মীরকাশিম

(c) দ্বিতীয় শাহ আলম (d) সুজাজি্দৌল্লা

**উঃ (a) সিরাজ-উদ-দৌল্লা**

**(vi) রেগুলেটিং আইন পাশ হয়েছিল**

(a) 1770-এ (b) 1771-এ

(c) 1773-এ (d) 1774-এ

**উঃ (c) 1773-এ**

**(vii) বোর্ড অফ রেভিনিউ গঠন করেন**

(a) লর্ড লিটন (b) লর্ড রিপন

(c) লর্ড কর্নওয়ালিশ (d) ওয়ারেন হেস্টিংস

**উঃ (d) ওয়ারেন হেস্টিংস**

**(viii) শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে পরিচিত কারা?**

(a) কেরি-হিকি-ওয়ার্ড (b) ডাফ-কেরি-মার্শমান

(c) হেয়ার-ডাফ-কেরি (d) কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ড

**উঃ (d) কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ড**

**(ix) শিমনোসেকির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়**

(a) 1894-এ (b) 1895-এ

(c) 1896-এ (d) 1897-এ

**উঃ (b) 1895-এ**

**(x) সত্যশোধক সভা প্রতিষ্ঠা করেন**

(a) দয়ানন্দ সরস্বতী (b) কেশবচন্দ্র সেন

(c) জ্যোতিবা ফুলে (d) রামমোহন রায়

**উঃ (c) জ্যোতিবা ফুলে**

**(xi) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত নন**

(a) এস. এ. ডাঙ্গে (b) মুজফফর আহমেদ

(c) সোমনাথ লাহিড়ী (d) ফিলিপ স্ক্র্যাট

**উঃ (c) সোমনাথ লাহিড়ী**

**(xii) ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বোস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন**

(a) গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (b) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

(c) পট্টভি সীতারামাইয়া (d) জওহরলাল নেহেরু

**উঃ (c) পট্টভি সীতারামাইয়া**

**(xiii) মুসলিম লীগের যে অধিবেশনে পৃথক পাকিস্তান-এর দাবি তোলা হয় সেটি হল**

(a) লাহোর (b) লক্ষ্ণৌ

(c) করাচি (d) ঢাকা

**উঃ (a) লাহোর**

**(xiv) "Now or Never" শীর্ষক পুস্তিকাটি লেখেন**

(a) আগা খান (b) মহঃ আলি জিন্নাহ

(c) বাল গঙ্গাধর তিলক (d) চৌধুরী রহমৎ আলি

**উঃ (d) চৌধুরী রহমৎ আলি**

**(xv) ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে কারা?**

(a) ইংরেজ (b) ওলন্দাজ

(c) ফরাসী (d) পর্তুগীজ

**উঃ (b) ওলন্দাজ**

**(xvi) ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয়**

(a) 1946-এর 4 ঠা জুলাই (b) 1946-এর 14 ই আগস্ট

(c) 1947-এর 4 ঠা জুলাই (d) 1947-এর 14 ই আগস্ট

**উঃ (c) 1947-এর 4 ঠা জুলাই**

**(xvii) স্তম্ভ-১ এর সাথে স্তম্ভ-2 মেলাও :**

| **স্তম্ভ-১** | **স্তম্ভ-২** |
|---|---|
| (i) ম্যাক্সিম লিটভিনভ | (A) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী |
| (ii) উইস্টন চার্চিল | (B) মার্কিন রাষ্ট্রপতি |
| (iii) জোসেফ স্টালিন | (C) রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী |
| (iv) হ্যারি ট্রুম্যান | (D) রুশ রাষ্ট্রপতি |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-C, (ii)-A, (iii)-B, (iv)-D (b) (i)-A, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-B

(c) (i)-C, (i)-A, (iii)-D, (iv)-B (d) (i)-B, (ii)-D, (iii)-C, (iv)-A

**উঃ (c) (i)-C, (ii)-A, (iii)-D, (iv)-B**

**(xviii) ফুলটন বক্তৃতা দিয়েছিলেন**

(a) চার্চিল (b) রুজভেল্ট

(c) স্তালিন (d) কেন্নান

**উঃ (a) চার্চিল**

**(xix) জেনারেল নেগুইব কোন দেশের সেনানায়ক ছিলেন ?**

(a) মিশর (b) ইজরায়েল

(c) আলজেরিয়া (d) লিবিয়া

**উঃ (a) মিশর**

**(xx) মাইলাই ঘটনাটি ঘটেছিল**

(a) জাপানে (b) চীনে

(c) কোরিয়ায় (d) ভিয়েতনামে

**উঃ (d) ভিয়েতনামে**

**(xxi) প্যাট্রিক লুমুম্বা কোন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ?**

(a) ঘানা (b) কঙ্গো

(c) মরক্কো (d) মাল্টা

**উঃ (b) কঙ্গো**

**(xxii) ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের মূল রূপকার কে ছিলেন ?**

(a) জওহরলাল নেহরু (b) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(c) বল্লভভাই প্যাটেল (d) মেঘনাদ সাহা

**উঃ (b) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ**

**(xxiii) ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয়**

(a) 1950 খ্রিস্টাব্দে (b) 1951 খ্রিস্টাব্দে

(c) 1955 খ্রিস্টাব্দে (d) 1960 খ্রিস্টাব্দে

**উঃ (a) 1950 খ্রিস্টাব্দে**

**(xxiv) 1951 খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব্ টেকনোলজি স্থাপিত হয়**

(a) শিবপুর-এ (b) কানপুর-এ

(c) খড়গপুর-এ (d) যাদবপুর-এ

**উঃ (c) খড়গপুর-এ**

**2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়): $1 \times 16 = 16$**

**(i) সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝো?**

**উঃ** সাম্রাজ্যবাদ হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি কর্তৃত্বকারী দেশ অন্য দেশের উপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

**(ii) ভাস্কো-দা-গামা কবে ভারতে আসেন?**

**উঃ** ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে

**অথবা**

**বাণিজ্যিক মূলধন বলতে কী বোঝায়?**

**উঃ** ঔপনিবেশিক নীতির প্রসার, শাসকদের দ্বারা বণিকদের একচেটিয়া ও বিশেষ অধিকার দান, অনুকূল বাণিজ্যের ভারসাম্য স্থাপন, শিল্প সংরক্ষণ নীতি বাণিজ্যিক মূলধনের পর্যায়ভুক্ত।

**(iii) কত সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়?**

**উঃ** ১৭৮৩ সালে

**(iv) ভারত সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?**

**উঃ** স্যার এলিজা ইম্পে

**অথবা**

**সূর্যাস্ত আইন কী ছিল**

**উঃ** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত জমিদারদের বছরের শেষ দিনে সূর্য অস্ত যাবার আগে, সরকারি খাজনা সরকারি কোষাগারে জমা করতে হতো। নতুবা অনাদায়ে জমিদারি হারাতে হতো। এই আইনটি সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত।

**(v) ক্যান্টন বাণিজ্য কাকে বলে?**

**উঃ** চিনের ক্যান্টন বন্দরের মাধ্যমে বিদেশিদের সঙ্গে চিনের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাকে ক্যান্টন বাণিজ্য বলা হয়।

**অথবা**

**ভারতে কবে রেলপথ প্রথম স্থাপিত হয়?**

**উঃ** ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে

**(vi) চার্লস উড কে ছিলেন?**

**উঃ** শিক্ষা বিষয়ে ১৮৫৪ সালের প্রতিবেদন রচনাকার

**(vii) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ছিলেন?**

**উঃ** জেমস উইলিয়াম কোলভিল / স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

**(viii) আর্য সমাজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**

**উঃ** ১৮৭৫ সালে

**অথবা**

**4 ঠা মে আন্দোলন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?**

**উঃ** ১৯১৯ সালে

**(ix) সিমলা সাক্ষাৎকারে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব কে দেন?**

**উঃ** আগা খান

**অথবা**

**ভারতীয়রা সাইমন কমিশন বর্জন করেছিলেন কেন?**

**উঃ** কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি না থাকার জন্য।

**(x) পুণা চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?**

**উঃ** ১৯৩২ সালে

**অথবা**

**বিশ শতকে বাংলায় কবে মন্বন্তর হয়েছিল**

**উঃ** ১৯৪৩ খ্রি. / ১৩৫০ বঙ্গাব্দে।

**(xi) সি. আর. ফর্মুলা কী?**

**উঃ** ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে যে সমাধানসূত্র চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারি তৈরি করেন, তার নাম সি.আর. ফর্মূলা।

**অথবা**

**সুভাষচন্দ্র বসু কাকে 'পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক' বলে অভিহিত করেন?**

**উঃ** সুভাষচন্দ্র বসু

**(xii) কবে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে স্থাপিত হয়?**

**উঃ** ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে

**(xiii) ন্যাটো (NATO)-র পুরো কথা কী?**

**উঃ** North Atlantic Treaty Organisation

**(iv) জেনেভা সম্মেলন কেন ডাকা হয়?**

**উঃ** ভারত-চিন সমাধানসূত্র, ভিয়েতনাম সমস্যা মেটানোর জন্য।

**অথবা**

**প্রথম নির্জোট সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?**

**উঃ** বান্দুং-এ

**(xv) তৃতীয় বিশ্ব কী?**

**উঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন জোটভুক্ত দেশগুলি বাদে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও অনুন্নত দেশগুলি 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে পরিচিত।

**(xvi) হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা কে ছিলেন?**

**উঃ** ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান

# HISTORY

## 2019

## খণ্ড - ক

**১। যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও। (প্রতিটি বিভাগ থেকে ন্যূনতম দুটি প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক): (8×5=40)**

**(i) মিউজিয়ামের (জাদুঘরের) প্রকারভেদ আলোচনা করো। 8**

**উঃ** জাদুঘরের ধারণা (Concept of Museum) ঃ- ইতিহাসের বিচারে জাদুঘরকে বহুভাগে ভাগ করা হয়। একটি বড় জাদুঘরে যেমন একাধিক বিভাগ থাকে, তেমনি একটি বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিশেষ মিউজিয়াম তৈরি হয়। প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology), নৃতত্ত্ব (Anthropology), চিত্রকলা (Painting), জীবনীমূলক (Biography) জাদুঘর।

**জাদুঘরের প্রকারভেদ (Category of Museum) ঃ**

**(i) প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর (Archaeological Museum) ঃ** এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থাকে ও জনগণের দেখার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এমনকি মুক্ত পরিবেশ (Open Space) ও গড়ে তোলা হয়। যেমন; রোমান ফোরাম, এথেন্সের এগোরা। ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালা প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের তালিকায় পড়ে।

**(ii) চিত্রকলা মিউজিয়াম (Art Museum) ঃ** এই জাদুঘর Art Gallery নামেও পরিচিত। আর্ট মিউজিয়ামে মৃৎশিল্প, আসবাবপত্র, ধাতব দ্রব্য সংগ্রহে রাখা হয়। চিত্রকলা মিউজিয়ামের তালিকায় রয়েছে—(i) অ্যাসমোলেন সংগ্রহশালা, (ii) ব্রিটিশ মিউজিয়াম (iii) হারমিটেজ সংগ্রহশালা ও (iv) প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়াম।

**(iii) জীবনীমূলক মিউজিয়াম (Biography Museum) ঃ** কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সময়কালের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জাদুঘরে সংরক্ষিত থাকে। অনেকসময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রনায়কের বাড়ি জীবনীমূলক মিউজিয়াম হতে পারে। যেমন– মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের স্মরণে আমেরিকায় তৈরি Sagamore Hill House, দিল্লির নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধি মিউজিয়াম উল্লেখযোগ্য।

**(iv) সামরিক মিউজিয়াম (Military Museum / War Museum) ঃ** দেশের সামরিক ইতিহাস তুলে ধরা, অনেক সময় জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামরিক মিউজিয়াম তৈরি হয়। এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, পোশাক, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নাগরিক জীবন তুলে ধরা হয়। উদাহরণ— Imperial War Museum.

**(v) বিজ্ঞান মিউজিয়াম (Science Museum) ঃ** এখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন, বিবর্তন-এর ইতিহাস সংরক্ষণ করা হয়। এই ধরনের জাদুঘরে রেল, মহাকাশবিদ্যা,

কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়ের বিবর্তন তুলে ধরা হয়ে থাকে। এই ধরনের মিউজিয়ামে ছবির মাধ্যমেও 3D Film প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও রয়েছে।

**(vi) শিশু মিউজিয়াম (Children Museum) ঃ** শিশুদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রদানের উদ্দেশ্যে শিশু মিউজিয়াম তৈরি হয়। এই মিউজিয়াম অলাভজনক। ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক শিশু মিউজিয়াম তৈরি হয়।

**(ii) উপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝো? এর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করো।** ৪+৪=৮

**উঃ উপনিবেশবাদের ধারণা ঃ**

সাধারণভাবে উপনিবেশবাদ বলতে (Colonialism) বোঝায় কোনো একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো দুর্বল রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব। উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডেভিড টমসনের অভিমত ব্যবহার করা যেতে পারে। টমসন বলেছেন উপনিবেশ দখলের জন্য নগ্ন লড়াই ইউরোপের মধ্যে বৃহৎ শক্তিগুলির আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন। ইংলন্ড, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি মনে করত যে, উপনিবেশ অধিকার না করলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে না। সেই কারণে তারা নিজ নিজ দেশের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালায়।

শুধু উপনিবেশগুলির ভূখণ্ড দখল নয়, বিজিত জাতিকে (Ruled Nation) নিজ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, জাতীয় গৌরব, প্রাধান্য মেনে নিতে বাধ্য করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলতঃ তারা বিজিত জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও বৈষম্য নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি আমেরিকায় তাদের জাতিগত বৈষম্যনীতি গ্রহণ করে।

**উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ঃ**

এই দুই ধারণার সম্পর্ক ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদরা তাদের ভাবনার আলোকে ব্যাখ্যা করেন।

**হবসনের তত্ত্বের ব্যাখ্যা ঃ-** ১৯ এবং ২০ শতকের উপনিবেশ সম্প্রসারণের জন্য নতুন অর্থনৈতিক শক্তির সক্রিয়তাকে হবসন দায়ী করেন। হবসন বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের মূল শিকড় হল উদ্‌বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র অনুসন্ধান। সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে যে বাড়তি অতিরিক্ত সঞ্চয় হয়েছিল তা থেকেই এই বাড়তি পুঁজি এসেছিল।

"Imperialism : A Study" বইতে হবসন বলেন সাম্রাজ্যবাদের চালিকাশক্তি হল আর্থিক লাভ। পুঁজিবাদীরা মুনাফা ভোগ করে প্রচুর মূলধন জমাতে থাকে। এই মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা বাড়ানোর জন্য পুঁজিপতিরা তাদের দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলে বাধ্য করে। কাঁচামাল ও বাজারের উপর পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকার ঘিরে উপনিবেশবাদ গড়ে ওঠে।

**লেনিনের তত্ত্ব ঃ** "Imperialism : The Highest Stage of Capitalism" গ্রন্থে লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে একচেটিয়া পুঁজিবাদের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়রূপে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের পিছনে উৎপাদনের পুঞ্জিভবনের ভূমিকা রয়েছে। বড় বড় শিল্পের প্রসার, উৎপাদনের বড় অংশের উপর পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণ, বাজার দখল, পুঁজিপতিদের জোট তৈরির মাধ্যমে পুঁজিপতিরা উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। লেনিন আরও বলেছেন সাবেকি পুঁজিবাদের অবাধ প্রতিযোগিতার প্রাধান্যের যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পণ্য রফতানি। পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে কয়েকটি উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশের হাতে ব্যাপক পরিমাণ পুঁজি জমতে থাকে। ঐ পুঁজি আর নিজ দেশে বিনিয়োগ সম্ভব নয় বলে তারা এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোর উপর বিনিয়োগের মাধ্যমে উপনিবেশ বিস্তারে সচেষ্ট হয়।

**(iii) ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ও প্রভাব আলোচনা করো।** **৩+৫=৮**

**উঃ** **প্রেক্ষাপটঃ** ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরেজরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি সর্বপ্রথম ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেন। ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল ডালহৌসির উদ্যোগে Great Indian Peninsular Rail Company মুম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত মোট ২১ মাইল দীর্ঘ রেলপথ চালু করে।

**উদ্দেশ্যঃ**

উপনিবেশ সাম্রাজ্যস্থাপন ঃ রেল দ্বারা কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দরের সঙ্গে এই দেশের কাঁচামাল উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের যোগাযোগ তৈরি করা, অল্প খরচে কাঁচামাল ইংলন্ডে পাঠানো এবং ইংলন্ডের উৎপাদিত দ্রব্য ভারতের বাজারে আনা।

সামরিক উদ্দেশ্য ঃ রেলপথ স্থাপনের সময় সরকার সামরিক দিকটি মাথায় রেখেছিল। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও সীমান্ত নিরাপত্তা বিধানের জন্য দ্রুত সৈন্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার রেলপথ স্থাপনে উদ্যোগী হয়।

ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা ঃ ভারতে রেলপথ স্থাপিত হলে প্রচুর লোহার সরঞ্জাম ইঞ্জিন, রেলকামরা প্রভৃতির চাহিদা বাড়বে বলে ইংরেজ ইস্পাত ব্যবসায়ীরা মনে করেছিল। ফলে ভারতে রেলের সম্প্রসারণ তাদের পক্ষে লাভজনক হবে।

**রেলপথ স্থাপনের প্রভাবঃ**

শিল্পের বিকাশ ঃ কার্ল মার্কস মনে করতেন, ''রেলপথ ছিল ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের অগ্রদূত।" সার্বিক বিচারে রেলের হাত ধরে পণ্য পরিবহণের ব্যয়ভার কমে যায়, এর ফলে পাট, চা, চিনি, কয়লা, বস্ত্র ও চামড়া শিল্পের প্রসার ঘটে।

কর্মসংস্থান ও জীবিকা ঃ ভারতীয় রেলের হাত ধরে জীবিকা ও কর্মসংস্থানের দরজা খুলে গিয়েছিল। ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত রেলের কর্মীসংখ্যা ছিল ৩৪,০০০; ১৮৯৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৩,০০,০০০ কাছাকাছি পৌঁছায়।

**বাণিজ্য বিস্তার ঃ** রেলস্থাপনের ফলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশালভাবে বেড়ে যায়। এছাড়া এদেশের মানুষের গমনাগমন বাড়ে, পণ্য পরিবহন দ্রুত সহজ হয় এবং ভারতের কৃষিপণ্যের রফতানি যথেষ্ট বেড়ে যায়।

**অথবা**

**ক্যান্টন বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? এই বাণিজ্যের অবসান কেন ঘটে?** ৩+৫=৮

**উঃ ক্যান্টন বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ঃ**

**বণিকদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ঃ** ক্যান্টন বন্দরে বিদেশি বণিকরা হং নামে চিনা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ব্যাবসা করতে বাধ্য ছিল। এরা সম্মিলিতভাবে কোহং নামের একটি গিল্ড তৈরী করে ক্যান্টন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত, এবং এই গিল্ড সরাসরি চিনা সম্রাটের অধীনে ছিল।

**কোহং-দের দুর্নীতি ঃ** ক্যান্টন ব্যাবসার মূল নিয়ন্ত্রণ কোহং-দের হাতে থাকায় এরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চিনা প্রশাসন, রাজকর্মচারীদের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে তারা ক্যান্টনে বৈদেশিক বাণিজ্যের শর্তাবলী নির্ধারণের অধিকার লাভ করে।

**রুদ্ধদ্বার নীতি ঃ** ক্যান্টন ব্যাবসার সূত্রে বিদেশী ব্যাবসায়ীরা যাতে চিনে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে তার জন্য বিদেশী ব্যাবসায়ীদের ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। যেমন বিদেশী ব্যাবসায়ীদের চিনা ভাষা শিক্ষা, চিনা দাসদাসী নিয়োগ, চিনা পালকি ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি বিদেশী ব্যাবসায়ীদের চিনের দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আইন মানতে বাধ্য করা হত এই সকল নীতিকে 'রুদ্ধদ্বার নীতি' (Closed Door Policy) বলা হয়।

**ক্যান্টন বাণিজ্যের অবসানের কারণ**

**(i)** চিনের বাণিজ্য সম্পর্কে রুদ্ধদ্বার নীতি ছিল ইউরোপের ব্যাবসায়ীদের কাছে অসুবিধের এবং অপমানজনক। এই কারণে ইউরোপের ব্যাবসায়ীরা চিনা সরকারের এই নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।

**(ii)** ব্রিটিশ সরকার ক্যান্টন বাণিজ্যের শর্তাবলী ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য চিন সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হলে ব্রিটিশ সরকার চিনকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেয় এবং ১৮৪২ সালে স্বাক্ষরিত নানকিং চুক্তি অনুযায়ী চিনা সরকার সাংহাই, অ্যাময়, নিংপো, এবং ফুচাও বন্দর বিদেশী ব্যাবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

**(iii)** ১৮৫৯ সালের পর থেকে ক্যান্টন বন্দরে ব্রিটিশদের ব্যাবসা বাণিজ্যের কোনো কাজ হত না, সেই কাজ চলত হংকং-কে কেন্দ্র করে। বেজিং, গ্র্যান্ড ক্যানাল এবং পীত নদী থেকে হংকং-এ নিকটত্ত্ব পশ্চিমের ব্যাবসায়ীদের কাছে তার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল।

প্রথম আফিন যুদ্ধে ব্রিটেনের জয়লাভ ক্যান্টন ব্যাবসার অবসানের প্রধান কারণে পরিণত হয়েছিল।

**(iv) সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়-এর অবদান মূল্যায়ন করো। ৪+৪=৮**

**উঃ প্রসঙ্গ রামমোহন ঃ**

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতবাসী পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী এবং মানবতাবাদী ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যে সকল যুক্তিবাদী মহান ব্যক্তি বাংলার মানুষকে এই ধ্যানধারণায় প্রভাবিত হতে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

**সমাজ সংস্কার ঃ**

**সতীদাহ প্রথার অবসান ঃ** সতীদাহ প্রথার হাত থেকে সমাজকে, নারীজাতিকে মুক্ত করার জন্য সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জনমত সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। এবং তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের সই করা একটি আবেদন পত্র উইলিয়াম বেটিঙ্কের কাছে পাঠান এবং সরকার ১৮২৯ সালের আইন অনুযায়ী সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন।

**নারী মুক্তি ঃ** সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের নারীমুক্তি আন্দোলন ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তিনি সমাজে নারীজাতির অমর্যাদা এবং নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরোধিতা করতেন। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার তিনি ছিলেন সমালোচক।

**শিক্ষা সংস্কার ঃ**

**পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঃ** ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায় ছিলেন পথিকৃৎ। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচের নির্দেশ আসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা খাতে এই ১ লক্ষ টাকার দাবি জানিয়ে তিনি ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন।

**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ঃ** ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় রামমোহন বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ, ১৮২৫ সালে বেদান্ত কলেজ এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন, বর্তমানের স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আলেকজান্ডার ডাফের উদ্দ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

**গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা রচনা ঃ** বাংলা ভাষায় রচিত গৌড়িয় ব্যাকারণ বেদান্ত গ্রন্থ সহ প্রায় ২৩টি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সংবাদ কৌমুদি এবং মিরাৎ উল আকবর নামের পত্রপত্রিকা। এছাড়াও তিনি সংবাদপত্র দমন আইনের বিরোধিতা করেছিলেন।

**মূল্যায়ন ঃ** সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় যে রাজা রামমোহন রায় যেভাবে শিক্ষা এবং সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে একটি মূল্যবোধযুক্ত সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই কারণে তাকে নির্দ্বিদায় আধুনিক ভারতের জনক বলাটা অসংগত নয়।

## খণ্ড - খ

**(v) লক্ষ্ণৌ চুক্তির শর্তাবলী উল্লেখ করো। এই চুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।** ৪+৪=৮

**উঃ পটভূমিকাঃ**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল ভুলে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে উদ্দ্যোগী হয় এবং এর বাস্তব প্রয়োগ ছিল ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি।।

**শর্তাবলী ঃ** লক্ষ্ণৌ চুক্তির মূলকথা ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, বিকেন্দ্রীকরণ, এবং ভারতীয়করণ। জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের যৌথ উদ্দ্যোগে সম্পাদিত লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে বলা হয়েছিল,—

(i) পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় কংগ্রেস মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের দাবিগুলি মেনে নেবে।

(ii) কংগ্রেসের স্বরাজের দাবিকে মুসলিম লিগ সমর্থন করবে।

(iii) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের ১/৩ অংশ হবে মুসলিম প্রতিনিধি। তবে সংরক্ষিত আসন ছাড়া অন্য কোনো আসনের, কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

(iv) কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ উভয়দল যৌথভাবে শাসন সংস্কারের দাবি উত্থাপন করবে।

(v) ভারত সচিবের দুজন সরকারীর মধ্যে একজন হবে ভারতীয়।

(vi) অন্য ডোমিনিয়ানের মর্যাদা এবং প্রতিনিধিত্ব ভারতকে দিতে হবে।

**গুরুত্বঃ**

(i) ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ চুক্তি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের পরিবেশ তৈরী করে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র বলেছেন, লক্ষ্ণৌ চুক্তি হল হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে হিন্দু মুসলমান ঐক্য ফিরে এসেছিল, অন্যদিকে বালগঙ্গাধর তিলক এবং মহম্মদ আলি জিন্নার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছিল।

(ii) লক্ষ্ণৌ চুক্তির মধ্য দিয়ে যে হিন্দু মুসলিম ঐক্য গড়ে ওঠে তা স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন অধ্যায় রচনা করে এবং খিলাফত আন্দোলনে, অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানেদের ব্যাপক সারা লক্ষ্য করা যায়।

(iii) এই চুক্তির ফলে ১৯১৯ সালে মন্টেগু টেমস্ ফোর্ড আইনের দ্বারা ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ লক্ষ্ণৌ চুক্তি সার্বিকভাবে ভারতে হিন্দু মুসলমান ঐক্য গঠন করতে পারেনি। মুসলিমদের জন্য আলাদা নির্বাচনের নীতি মেনে নিয়ে কংগ্রেস ঠিক করেনি বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই চুক্তিকে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলে মনে করেন। তিনি বলেন এই চুক্তির দ্বারা যুক্তপ্রদেশের মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার নামে বাংলা এবং পাঞ্জাবের মুসলিমদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হয়। ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠির মতে এই চুক্তি ধর্মনিরপেক্ষ প্রচারের আদর্শ প্রসারে সহায়ক ছিল না। এই চুক্তি দিয়েই হিন্দু মুসলিম ঐক্য ফিরে আসলেও ভবিষ্যৎ-এ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তৈরীর সম্ভাবনা থেকে যায়।।

**(vi) ১৯৪৬-এর নৌ বিদ্রোহের কারণ ও তাৎপর্য লেখো।** ৪+৪=৮

**উঃ পটভূমিকাঃ**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অভ্যুত্থানের নাম নৌবিদ্রোহ। সুমিত সরকার লিখেছেন, ''ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড়ো ত্রাস অবশ্যই ছিল ১৯৪৬ সালে নৌবিদ্রোহ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপাখ্যানগুলির মধ্যে যা সত্যি সবচেয়ে বীরোচিত, যদিও অনেকটা বিস্মিত।''

**কারণঃ**

**বৈষম্যমূলক আচরণ ঃ** বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ব্রিটিশ সরকার উচ্চপদগুলো শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত রাখত। সমযোগ্যতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য থাকার সত্ত্বেও ভারতীয় নৌসেনারা ওই পদ পেতে পারত না। এমনকি ভারতীয় ও ইউরোপীয় সেনাদের মধ্যে বেতন ও ভাতার পার্থক্য ছিল।

**কর্মছাটাই ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে বিভিন্ন জায়গায় ব্রিটিশ সরকার বহু ভারতীয় সৈন্য নিয়োগ করলেও যুদ্ধের পর তাদের ছাটাই করা হয়। ফলে কর্মহীন এই সকল নৌসেনারা সরকারের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিল।

**আজাদহিন্দ বাহিনীর বিচার ঃ** ব্রিটিশ সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার শুরু করলে ভারতীয় জনগণের মতো ভারতীয় নৌবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ তাদের অনুপ্রাণিত করে। রসিদ আলির বিচারে সাত বছরের কারাদন্ড নৌবাহিনীর মধ্যে অগ্নিগর্ব পরিস্থিতি তৈরী করে। ১৯৪৬ সালে ১৮ই ফ্রেবুয়ারি বোম্বাইয়ের তলোয়ার জাহাজে ভারতের নৌসেনার বিদ্রোহের সূচনা ঘটায়।

**তাৎপর্য ঃ** এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজরা বুঝতে পারে সাধারণ মানুষের পাশাপশি নৌসেনারা ইংরেজদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এই বিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হয়। নৌ সেনা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমে যায় এবং ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ শুরু হয়। এই বিদ্রোহের দরুন ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতে পাঠায়। ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্তের মতে এই বিদ্রোহ এক নবযুগের সূচনা ঘটিয়েছিল। সুমিত সরকার নৌ বিদ্রোহকে ''বীরোচিত সংগ্রাম'' বলেছেন।

**(vii) ১৯৫০-এর দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কমিউনিষ্ট চীনের প্রভাব নিরূপণ করো ?** ৮

**উঃ** ১৯৪৯ সালে মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে চিনে সাম্যবাদী রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাম্যবাদী চিন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠন ও তার বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা তৈরি করেছিল। বিশ্বরাজনীতিতে মার্কিনি নেতৃত্বে যে সাম্যবাদ বিরোধী অভিযান শুরু হয়েছিল, তার ফলে চিনকে ঠান্ডা লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

**সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া ঃ** ১৯৪৯ সালে চিনে গনপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তিনমাস আগে মাও-সে-তুং জানান যে, চিনের বিদেশনীতি সোভিয়েত মডেল অনুসরণ করে চলবে। এই কারণে চিনকে সোভিয়েত স্বীকৃতি জানায়, আরও পরে পূর্ব ইউরোপও পূর্ব এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি চিনকে স্বীকৃতি জানায়। বিশ্বে সাম্যবাদী আন্দোলন সুসংহত করার জন্য এবং মার্কিন সাম্যবাদ বিরোধী নীতির মোকাবিলার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। চিনের শিল্পায়ন, সমরকৌশল প্রভৃতি ক্ষেত্রে সোভিয়েত নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে এবং ১৯৫০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি চিন সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

**মার্কিন প্রতিক্রিয়া ঃ** চিনের উত্থান মার্কিনিদের বিচলিত করে। মার্কিনিরা জানত যে, গনপ্রজাতন্ত্রী চিনের উত্থান আসন্ন এবং সময়ের অপেক্ষা। তাই চিনকে ঠেকানোর জন্য মার্কিনিরা আগে চিয়াং কাইশেককে সমর্থন করেছিল। জাতিপুঞ্জের সদস্যপদলাভের সময়ও মার্কিনিরা চিনের বিরোধিতা করে। কোরিয়া যুদ্ধে চিন ১৯৫০ সালে কোরিয়াকে সমর্থন করে ও জাতিপুঞ্জের বাহিনির সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই কারণে ১৯৫০ এর দশকে মার্কিনিদের একমাত্র ও অন্যতম লক্ষ্য ছিল চিনে কমিউনিষ্ট শাসনের অবসান।

**তৃতীয় বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ঃ** ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের জুন মাসের মধ্যে বিশ্বের ১২টি দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী চিনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। চিন প্রথম থেকেই এশিয়া ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে বান্দুং এ চলা ১৮-২৪ এপ্রিলের আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনে চিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং উপনিবেশ বিরোধী এক সাধারণ রাষ্ট্রজোট তৈরি হয়। এমনকি চিন আফ্রিকার মানুষের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল। ১৯৬৪ সালে চৌ-এন-লাই

এর আফ্রিকা সফরের মধ্য দিয়ে আফ্রিকায় চিনের ভাবমূর্তি অনেকটা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছিল।

**অথবা**

**ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা সংক্ষেপে আলোচনা করো।** ৪+৪=৮

উঃ **পটভূমিকা ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মুদ্রাস্ফীতি ও আর্থিক মন্দা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। এই সময় পূর্ব ইউরোপে রুশ প্রসারণ পশ্চিম ইউরোপ ও তার মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির সংকট আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ মার্কিন কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে রুশ ভীতি ব্যক্ত করে।

**ট্রুম্যান নীতি উদ্দেশ্য**

(1) সাম্যবাদের প্রসার প্রতিরোধ করা ও মার্কিনি বানিজ্য সচল রাখা।

(2) আর্থিক সাহয্য বা ঋণদানের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে অস্ত্র বাণিজ্য অব্যাহিত রাখা।

(3) বৈদেশিক ক্ষেত্রে ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উদাসীনতা কাটিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা।

(4) কমিউনিষ্টদের প্রতিরোধ করার জন্য গ্রিস ও তুরস্কে আমেরিকা ট্রুম্যান ঘোষনা মোতাবেক ৪০ কোটি ডলার অর্থ সাহায্য প্রেরণ করে।

**মার্শাল পরিকল্পনা ঃ** ট্রুম্যান নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটে মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৪৯ সালে। ইউরোপের দেশগুলিতে আর্থিক সংকট বেড়ে গেলে সাম্যবাদের প্রসারে সহায়ক হয়ে ওঠে এবং এই কারণে আর্থিক পুনরুজ্জীবনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা রচিত হয়। ৫ই জুন মার্শাল হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় বলেন যে, ভবিষ্যতে ইউরোপীয় দেশগুলির পক্ষে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সংকটজনক হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও বিশ্বের ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে সাহায্য করবে।

**ঘোষণার সারবত্তা**

(১) আর্থিক সাহায্য কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পুর্ণগঠনের কাজে লাগাতে হবে।

(২) অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত দেশটিকে নিজের উদ্যোগে স্বয়ংভর হয়ে উঠতে হবে।

(৩) পরিকল্পনাটি দারিদ্র্য, ক্ষুধাত্ত বেকারত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ছিল।

**পরিকল্পনা রূপায়ণ ঃ** এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে একটি আইন অনুযায়ী কাজ শুরু করে। পরিকল্পনা মোতাবেক ঠিক হয় যে, ১৮টি দেশকে ৪বছরের জন্য সকলপ্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ১৯৪৮-১৯৫১ সালের জন্য ১২০০ কোটি ডলার বাজেটে ধরা হয়। ১৯৫২ সালে এই পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

**পরিকল্পনার মূল্যায়ন**

মার্শাল পরিকল্পনা যেসব ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছিল, তা হল—

(১) ইউরোপের আর্থিক মন্দা রোধ করতে সফল হয়েছিল।

(২) মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস হয়েছিল।

(৩) পশ্চিম ইউরোপ আর্থিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়।

(৪) পশ্চিম ইউরোপে নির্বাচনে গনতান্ত্রিক দলগুলি সাফল্য লাভ করে।

**(viii) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কী ছিল?**
**৫+৩=৮**

**উঃ** **ভাষা আন্দোলন ঃ** অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তান তৈরি হবার পর জিন্নাহ সাহেব উর্দুভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫০ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫১ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা স্বীকৃতি দানের জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার জন্য ১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সূচনা করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও মুজিবর রহমান ঃ বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার আওয়ামি লিগের সরকার গঠনের প্রক্রিয়া আটকানোর জন্য ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশ পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন ঃ সংকটজনক জাতীয় পরিস্থিতিতে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু অসহযোগের ডাক দেন। আন্দোলন দমন করার জন্য পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর নির্মম আক্রমণ শুরু করেন। বাংলাদেশের মাটিতে গণহত্যালীলা চালানো হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মধ্যরাতের একটি ভাষণে মুজিবর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিকগণ এই ভাষণের গভীরতা বলে মনে করেন, কারণ এরপরই এই ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন—

"This may be my last message From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh, Whenever you might be and with what ever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of Pakistan occupation army to expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved: এই ভাষণের পরই পাকিস্তান বাহিনি বঙ্গুবন্ধুকে গ্রেফতার করে।

অস্থায়ী সরকার ও ভারতের সমর্থন ঃ বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারির পর আওয়ামি লিগ নেতারা ভারতে আশ্রয় নেন ও অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি হন মজিবর রহমান, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তাজউদ্দিন আহমেদ। এইসময় বাংলাদেশী শরনার্থীদের তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সহায়তা দান করেন ও ৩রা ডিসেম্বর সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনী ৯০,০০০ মৌলবাদী পাকিস্তানি সেনাকে বন্দি করে এবং বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তানি সেনাপতি এ. কে নিয়াজি ১৬ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।

## খণ্ড - খ

**1. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে ডানদিকে নীচে প্রদত্ত বাক্সে লেখো :** **1 × 24 = 24**

**(i) SAPTA-এর সম্পূর্ণ নাম**

(a) South Asian Preferential Trade Agreement

(b) South African Preferential Trade Agreement

(c) Senegal and Portugal Trade Agreement

(d) Spain and Portugal Trade Agreement

**উঃ (a) South Asian Preferential Trade Agreement**

**(ii) আওয়ামী লীগ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন**

(a) সুরাবর্দি (b) ফজলুল হক

(c) শেখ মুজিবর রহমান (d) জুলফিকর আলি ভুট্টো

**উঃ (a) সুরাবর্দি**

**(iii) 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' ধারণাটি কোন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত?**

(a) সুকর্ণ (b) হো চি মিন

(c) সুহার্তো (d) নেলসন ম্যান্ডেলা

**উঃ (a) সুকর্ণ**

**(iv) ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কবে গঠিত হয়েছিল?**

(a) 1949 সালে (b) 1950 সালে

(c) 1951 সালে (d) 1952 সালে

**উঃ (b) 1950 সালে**

**(v) সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করেন**

(a) নাসের (b) জেনারেল নেগুইব

(c) বুলগানিন (d) টিটো

**উঃ (a) নাসের**

**(vi) ন্যাটো গঠিত হয়**

(a) 1947 সালে (b) 1948 সালে

(c) 1949 সালে (d) 1950 সালে

**উঃ (c) 1949 সালে**

**(vii) পঞ্চশীল নীতি স্বাক্ষরিত হয় ভারত ও**

(a) পাকিস্তানের মধ্যে (b) রাশিয়ার মধ্যে

(c) চীনের মধ্যে (d) তিব্বতের মধ্যে

**উঃ (c) চীনের মধ্যে**

**(viii)বার্লিন অবরোধকারী দেশ হল**

(a) ইংল্যান্ড (b) ফ্রান্স

(c) রাশিয়া (d) ইতালি

**উঃ (c) রাশিয়া**

**(ix) স্তম্ভ-1 এর সাথে স্তম্ভ-2 মেলাও :**

| **স্তম্ভ-1** | **স্তম্ভ-2** |
|---|---|
| (i) হিরোশিমা | (A) জাপান |
| (ii) থাকিন নু | (B) কুয়োমিং-টাং |
| (iii) পার্ল হারবার | (C) দোবাম অ্যাসোসিয়েশন |
| (iv) চিয়াং কাইশেক | (D) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-A, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-B (b) (i)-A, (ii)-B, (iii)-C, (iv)-D

(c) (i)-B, (ii)-A, (iii)-D, (iv)-C, (d) (i)-C (ii)-B, (iii)-D, (iv)-A

**উঃ (a) (i)-A, (ii)-C, (iii)-D, (iv)-B**

**(x) ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য ছিলেন না**

(a) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (b) লর্ড ওয়াভেল

(c) এ. ভি. আলেকজান্ডার (d) লর্ড পেথিক লরেন্স

**উঃ (b) লর্ড ওয়াভেল**

**(xi) 'ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম'-এর লেখক**

(a) সুভাষচন্দ্র বসু (b) নেহরু

(c) মহাত্মা গান্ধী (d) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

**উঃ (d) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ**

**(xii) পৃথক নির্বাচনের নীতি প্রবর্তিত হয় যে আইনের দ্বারা সেটি হল**

(a) ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 1892 (b) 1909 সালের ভারত শাসন আইন

(c) 1919 সালের ভারত শাসন আইন (d) ভারত শাসন আইন, 1935

**উঃ (b) 1909 সালের ভারত শাসন আইন**

অথবা

**'অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস কংগ্রেস'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন**

(a) মহাত্মা গান্ধী (b) জ্যোতিবা ফুলে

(c) বি. আর. আম্বেদকর (d) বীরসালিঙ্গম পানতুলু

**উঃ (c) বি. আর. আম্বেদকর**

**(xiii)ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন**

(a) জহরলাল নেহরু (b) ডঃ সীতারামাইয়া

(c) সুভাষচন্দ্র বসু (d) বল্লভভাই প্যাটেল

**উঃ (c) সুভাষচন্দ্র বসু**

**(xiv)মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়**

(a) 1906 সালে (b) 1909 সালে

(c) 1915 সালে (d) 1919 সালে

**উঃ (b) 1909 সালে**

**(xv) শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেন**

(a) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (b) কেশবচন্দ্র সেন

(c) শ্রীনারায়ণ গুরু (d) স্বামী বিবেকানন্দ

**উঃ (a) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী**

**(xvi) মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন**

(a) থিওডোর বেক (b) স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

(c) ইউসুফ আলি (d) মৌলভি মোমিন

**উঃ (a) থিওডোর বেক**

**(xvii) কোন গভর্নর-জেনারেল-এর আমলে 'মেকলে মিনিটস' গৃহীত হয়?**

(a) ওয়ারেন হেস্টিংস (b) ক্যানিং

(c) ডালহৌসি (d) বেণ্টিঙ্ক

**উঃ (d) বেণ্টিঙ্ক**

**(xviii) পিটের ভারত শাসন আইন পাশ হয়েছিল**

(a) 1773 সালে (b) 1774 সালে

(c) 1783 সালে (d) 1784 সালে

**উঃ (d) 1784 সালে**

**(xix)বন্দিবাসের যুদ্ধ হয়েছিল**

(a) 1760 সালে (b) 1765 সালে

(c) 1770 সালে (d) 1772 সালে

**উঃ (a) 1760 সালে**

**(xx) বাংলায় প্রথম স্বাধীন নবাব ছিলেন**

(a) মুর্শিদকুলি খাঁ (b) আলিবর্দি খাঁ

(c) সুজাউদ্দিন (d) সিরাজ-উদ-দৌলা

**উঃ (d) সিরাজ-উদ-দৌলা**

অথবা

**এশিয়ার কোন দেশ বিদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে?**

(a) ভারত (b) চীন

(c) ইন্দোনেশিয়া (d) শ্রীলঙ্কা

**উঃ (b) চীন**

**(xxi)উত্তমাশা অন্তরীপ সর্বপ্রথম প্রদক্ষিণ করেন**

(a) কলম্বাস (b) ম্যাগেলান

(c) বার্থোলোমিউ ডিয়াজ (d) ভাস্কো-ডা-গামা

**উঃ (c) বার্থোলোমিউ ডিয়াজ**

**(xxii) স্তম্ভ-1 এর সাথে স্তম্ভ-2 মেলাও :**

| **স্তম্ভ-1** | **স্তম্ভ-2** |
|---|---|
| (i) The Wealth of Nations | (A) J. A. Hobson |
| (ii) Imperialism : A Study | (B) Lenin |
| (iii) Imperialism : The Highest Stage of Capitalism | (C) Adam Smith |
| (iv) Uncle Tom's Cabin | (D) Harriet Beecher Stowe |

*বিকল্পসমূহ :*

(a) (i)-A, (ii)-B, (iii)-C, (iv)-D (b) (i)-B, (ii)-A, (iii)-D, (iv)-C

(c) (i)-C, (ii)-A, (iii)-B, (iv)-D (d) (i)-D, (ii)-C, (iii)-A, (iv)-B

**উঃ (c) (i)-C, (ii)-A, (iii)-B, (iv)-D**

**(xxiii) 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চার জনক' বলা হয়**

(a) থুকিডিডিসকে (b) হেরোডোটাসকে

(c) সু-মা-কিয়েনকে (d) ইবন খালদুনকে

**উঃ (a) থুকিডিডিসকে**

**(xxiv) মণিকুন্তলা সেন রচিত স্মৃতিকথার নাম**

(a) একাত্তরের ডায়েরী (b) আমি নেতাজীকে দেখেছি

(c) সেদিনের কথা (d) জীবনের জলসাঘরে

**উঃ (c) সেদিনের কথা**

**2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয় ) : 1 x 16 = 16**

**(i) স্বাধীন আলজেরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন ?**

**উঃ** আহমেদ বেন বেল্লা

**(ii) সুয়েজ সংকট সমাধানের জন্য কোন ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী লন্ডন সম্মেলনে (1956) যোগ দেন?**

**উঃ** কৃষ্ণ মেনন

**(iii) তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?**

**উঃ** সতীশচন্দ্র সামন্ত

**(iv) রাওলাট সত্যাগ্রহের সূচনা কে করেন এবং কবে?**

**উঃ** 1919 সালে, গান্ধিজী

অথবা

**মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা বলতে কি বোঝায়?**

**উঃ** কমিউনিস্টদের শ্রমিক শ্রেণির উপর প্রভাব নষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 32 জন কমিউনিস্ট সদস্যকে গ্রেফতার করে যে মামলা শুরু করে তা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত।

**(v) 1924-25-এর ভাইকম সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব কে দেন?**

**উঃ** শ্রী নারায়ণ গুরু।

অথবা

**একশো দিনের সংস্কার কী ছিল?**

**উঃ** 1898 সালের 11ই জুন সম্রাট কোয়াংসু চিনে শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে একশো তিন দিন ধরে যে সংস্কার করেছিলেন তাকে একশো দিনের সংস্কার বলা হয়।

**(vi) কবে এবং কেন তাইপিং বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?**

**উঃ** 1851 -1854 চিনে বিদেশীদের শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য তাইপিং বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

**(vii) ভারতের কোথায় কোথায় পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি গড়ে উঠেছিল?**

**উঃ** গোয়া, কোচিন, চট্টগ্রাম, হুগলি

**(viii)কোন দেশ মশলা দ্বীপপুঞ্জ নামে বিখ্যাত ছিল?**

**উঃ** ইন্দোনেশিয়ার মালাকা

**(ix) সার্ক (SAARC) কী?**

**উঃ** South Asian Association for Regional Co-operation

**(x) ফিদেল কাস্ত্রো কে ছিলেন?**

**উঃ** কিউবার রাষ্ট্রপতি

**(xi) আজাদ হিন্দ বাহিনীর 'ঝাঁসির রানী ব্রিগেড'-এর নেতৃত্ব কে দেন?**

**উঃ** লক্ষ্মী স্বামীনাথন / লক্ষ্মী সেহগল

অথবা

**রশিদ আলি দিবস কবে পালিত হয়?**

**উঃ** 1946, 12ই ফেব্রুয়ারি

**(xii) কে, কবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন?**

**উঃ** 1932, রামসে ম্যাকডোনাল্ড

অথবা

**'মাহাদ মার্চ' বলতে কী বোঝো?**

**উঃ** 1927 সালে কেরালায় উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য সংরক্ষিত জলাশয়ের জল অস্পৃশ্য মানুষদের দাবিতে আম্বেদকরের নেতৃত্বে মাহাদ মার্চ সত্যাগ্রহ হয়।

**(xiii) কে, কবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন?**

**উঃ** 1897, স্বামী বিবেকানন্দ

**(xiv) প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

**উঃ** আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ

**(xv) 'দস্তক' কী?**

**উঃ** বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্যের ছাড়পত্র।

অথবা

**1813 সালের সনদ আইনের গুরুত্ব কী ছিল?**

**উঃ** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের বিলুপ্তি

**(xvi)নতুন বিশ্ব বলতে কী বোঝো?**

**উঃ** আমেরিগো ভেসপুচি, তাঁর চিঠিতে কলম্বাস আবিষ্কৃত মহাদেশকে নতুন বিশ্ব বলেছিলেন।

অথবা

**'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা' বলতে কী বোঝানো হয়?**

**উঃ** এশিয়া, আফ্রিকার কালো চামড়ার অনুন্নত মানুষকে সুসভ্য করার জন্য ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ মানুষের দায়বদ্ধতা বোঝাতে শ্বেতাঙ্গদের বোঝা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

Price : ₹ 40/- only

*Printed at Saraswaty Press Ltd.*